ভারতের বীরাঙ্গনা



"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

শ্রীবিজয়কুমার ভৌমিক

মূল্য এক টাকা মাত্র।

খুলনা হইতে
গ্রন্থকার কর্তৃক
প্রকাশিত।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

১। চয়ন

বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের রচনা হইতে মনোরম সংগ্রহ। ভাষা-শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পুস্তক। মূল্য—১।০

২। বঙ্গের প্রতাপ

প্রতাপাদিত্যের মনোরম জীবনী। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

মুদ্রাকর—শ্রীমহেন্দ্র নাথ দত্ত
শ্রীসরস্বতী প্রেস
২৬।১, বেণিয়াটোলা লেন
কলিকাতা



উপহার

উৎসর্গ

আশৈশব যাঁহার কথা আমার প্রধান চিন্তার বিষয়
সেই জননী ভারত-ভূমির বন্ধন-ক্লেশ দূর করিতে
যে নারী দেবীগণ বিপদ ও অশান্তি বরণ
করিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের পবিত্র
কর-কমলে এই ক্ষুদ্র পুস্তক
তুলিয়া দিয়া কৃতার্থ
হইলাম।

সেবক বিজয়।

ভূমিকা

এ পুস্তকের উদ্দেশ্য স্পষ্ট—সে সম্বন্ধে কিছু লেখা বাহুল্য। তবে এইটুকু বলিতে চাই যে, লেখক বলিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্য আমার নাই, সে অহঙ্কারও করি না।

জীবনে বহুলোকের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। এত লোকের নিকট যদি উপকার না পাইতাম, তাহা হইলে হয় ত মানুষের উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিতাম। কিন্তু আজ সবচেয়ে বেশী মনে পড়িতেছে খুলনার প্রসিদ্ধ উকীল অজাতশত্রু দেশপ্রেমিক শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষের কথা। জীবনের বর্ত্তমান শঙ্কট-সময়ে সকল রকমে তাঁহার সাহায্য না পাইলে কোথায় ভাসিয়া যাইতাম তাহার ঠিক নাই —পুস্তক প্রকাশ ত দূরের কথা। একা তাঁহাকে জানিলেই যে কাহারও মানুষের প্রতি বিনষ্ট শ্রদ্ধা ফিরিয়া আসিতে পারে।

এই পুস্তক প্রকাশ করিতে শ্রীসরস্বতী প্রেসের

দেশহিতব্রত স্বত্বাধিকারিগণের, বিশেষতঃ উহার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্তের নিকট আমি যে সাহায্য পাইয়াছি তাহা চিরদিন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিব।

মহাত্মাজীর মহীয়সী পত্নীর কথা একটু ভাল করিয়া লিখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না। এ বিষয়ে মহাত্মার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস তাঁহার স্বল্প অবসরের মধ্যে দুই একটি কথা যাহা জানাইয়াছিলেন তাহাই আমার অবলম্বন। এজন্য তাঁহার নিকট আমি একান্ত কৃতজ্ঞ। মনোমত করিয়া লিখিতে না পারিলেও আমার সান্ত্বনা এই যে, শ্রীমতী কস্তুরীবাই গান্ধীর নামের উল্লেখেই আমার এ তুচ্ছ পুস্তক পবিত্র হইয়াছে।

কলিকাতা,
২২শে আষাঢ়,
১৩৩১ সাল। } শ্রীবিজয়কুমার ভৌমিক।

নারীজাতির প্রতি নিবেদন।

✤ ❋ ✤

বাংলার নারী

তোমরা আমাদের বন্ধন-শৃঙ্খল। আমরা জগতের উন্নতিপথে অনেক পিছনে পড়িয়া আছি;—অগ্রসর হইতে উৎসুক; কিন্তু তোমরা আমাদের অগ্রগতি-ব্যগ্রপদে অতি কোমল অথচ সুদৃঢ় বন্ধন সৃজন করিতেছ। আমাদের দেশমাতা শত শত বৎসর পরাধীনা; দাসত্ব-শৃঙ্খলে নিপীড়িতা। মায়ের সেই অতি লজ্জার, অতি অপমানের, অতি দুঃখের শৃঙ্খল ঘুচাইতে আমাদের মন ব্যাকুল, হস্ত উদ্যত। তোমরা আমাদের সেই ব্যাকুল মনে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছ, উদ্যত হস্ত স্বার্থচিন্তার নিগড়দ্বারা সংযত করিয়াছ। বাংলার নারী, তোমরা আমাদের এখনও দাসত্বে আবদ্ধ থাকিবার কারণ। তোমরা আমাদিগকে পুরুষত্ব-মনুষ্যত্ব-হীন করিতেছ।

জগতে সর্ব্বত্রই মাতা মানুষের প্রথম শিক্ষয়িত্রী। মাতৃ-স্তন্যের সহিত যে শিক্ষা, যে ভাব আমরা গ্রহণ করি, তাহা আমাদের অস্থিমজ্জাগত হইয়া যায়—মন্দ বুঝিলেও পরে তাহা ত্যাগ করা সুকঠিন হইয়া পড়ে। স্বাধীন দেশের মায়েরা তাঁহাদের সন্তানদের শিক্ষা দেন তাঁহাদেরই প্রতিরূপ, স্বর্গ হইতেও গরীয়সী জন্মভূমির উপর প্রগাঢ় ভক্তি করিতে, তাঁহার জন্য জীবনদান, সর্ব্বস্বদান অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া ভাবিতে, দেশমাতার দুর্দ্দশার কারণ ঘটিলে তাঁহারা সন্তানকে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব বলি দিতে উদ্বোধিত করেন। কিন্তু বাংলার মায়েরা, তোমরা আমাদিগকে এ গৌরব করিবার কি বিন্দুমাত্র অধিকার দিয়াছ? তোমরা আমাদিগকে শিক্ষা দেও হীন স্বার্থকে মনুষ্য-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ভাবিতে, দাসিত্বকে গৌরব মনে করিতে, সর্ব্ব-গরীয়সী জননী জন্মভূমিকে চিরদাসী করিয়া রাখাকে নিতান্ত স্বাভাবিক বোধ করিতে। তোমাদের বক্ষ-সুধায় জানি না কি বিষ আমাদের মনে সঞ্চারিত কর, যাহাতে

আমাদিগকে সেই মাকে মা বলিয়া চিনিতে, ভাবিতে দেয় না। এত সত্ত্বেও, এই কুশিক্ষার বিষে জর্জ্জরিত হইয়াও যদি আমাদের কেহ জননী জন্মভূমিকে মা বলিয়া চিনিতে পারে, তাঁহার দুঃখ দূর করিতে যত্নবান হয়, তোমরা স্নেহের অছিলায় তাহার হাত চাপিয়া ধর, কর্ত্তব্যের নামে তাঁহার হৃদয়ে স্বার্থের বোঝা চাপাইয়া দাও, নিজেদের ক্ষুদ্র সুখ-সমৃদ্ধিকে তাহার নিকট অতি বৃহৎ করিয়া ধর—দুর্ভাগ্য সে তাহার সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়, হীন স্বার্থ-পঙ্কে শূকরের অধম জীবন-যাপনকে সুখ বলিয়া গ্রহণ করে। মাতৃজাতির, মা নামের এ কি কলঙ্ক!

বাংলার মা, তুমি স্নেহে অন্ধ। যাহারা তোমাকে ঠিক জানে, তাহরা জানে তুমি এই যে আমাদের মুখ্য কর্ত্তব্যের পথে অতি হীন বাধা সৃষ্টি করিতেছ, তাহাতে তোমার ব্যক্তিগত স্বার্থকল্পনা, সুখ-সুবিধা-সম্ভোগের ইচ্ছা কত কম। তুমি সম্ভবতঃ সন্তানের কল্পিত ইষ্টের জন্য অন্ধ। মাগো, তোমার চরণে প্রার্থনা—

অন্ধ মোহবন্ধ তব দাও মুক্ত করি' !
রেখোনা বসায়ে দ্বারে জাগ্রত প্রহরী
হে জননী, আপনার স্নেহ-কারাগারে
সন্তানেরে চিরজন্ম বন্দী রাখিবারে।
বেটন করিয়া তারে আগ্রহ-পরশে,
জীর্ণ করি দিয়া তারে লালনের রসে,
মনুষ্যত্ব স্বাধীনতা করিয়া শোষণ
আপন ক্ষুধিত চিত্ত করিবে পোষণ ?
দীর্ঘ গর্ভবাস হ'তে জন্ম দিলে যার
স্নেহগর্ভে গ্রাসিয়া কি রাখিবে আবার ?
চলিবে সে এ সংসারে তব পিছু পিছু ?
সে কি শুধু অংশ তব আর নহে কিছু ?
নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্ব দেবতার,
সন্তান নহেগো মাতঃ সম্পত্তি তোমার।
আর, হিন্দুর স্ত্রী, তুমি স্বামীর শুধু শয্যাসঙ্গিনী নহ,
সেবায় কিঙ্করী তুমি, জননী ভোজনে,
বিপদে ভ্রাতার প্রায়,
বন্ধু হেন মন্ত্রণায়,

সর্ব্বোপরি তুমি সহধর্ম্মিণী। আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য, সর্ব্বোপরি ধর্ম্ম দেশমায়ের দুর্দ্দশা দূর করা। সহধর্ম্মিণীরূপে তোমার উচিত সেই কর্ত্তব্যে আমরা উদাসীন থাকিলে, তাহাতে আমাদিগকে উদ্বোধিত করা। তুমি সে কর্ত্তব্য পালন ত করিতেছই না, বরং আমাদিগের মধ্যে কেহ দেশমাতৃকার ভাতি মর্ম্ম-পীড়াদায়ক দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার সেবাকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিলেও তুমি সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য পালন কর না, আমাদের সেই ধর্ম্মকে আপন ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ কর না—পরন্তু সেই ধর্ম্মপথে বিঘ্ন জন্মাও। তোমার নিকট আমাদের অনেক আশা, অনেক দাবী। মাতা প্রায়শঃই সন্তানকে নিজের সম্পত্তি মনে করিয়া তাহার হৃদয়ে নিজের ক্ষুদ্র-চিন্তার আধিপত্য বিস্তার করিতে চাহেন, সন্তানকে স্বার্থের সঙ্কীর্ণ কারাগার ভেদ করিতে দেখিলে ক্ষুব্ধ, রুষ্ট হন। কিন্তু তুমি ত নিজের নিজত্ব বিলাইয়া স্বামীর ধর্ম্মভাগিনী হইয়া থাক—সেই ত তোমার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু এখন কেন স্বামীর কর্ত্তব্যের সহিত সম্বন্ধশূন্যা হইয়া শুধুই

যেন 'গণিকা গণিতা তুমি সুখদ শয়নে'? নিজের এই নশ্বর শরীরের সুখ ও আরামের বিঘ্ন হওয়ার ভয়ে এখন তুমি ত্রাসিতা। এই হীন ভয়ই আমাদের চিরপূজ্যা মায়ের যথার্থ বন্ধন-শৃঙ্খল। কিন্তু চিরদিন

কামিনী কাতরা ত্রাসে—কে ভাষে এমন ?
দেখ খুলি গত কাল দ্বার,—
চিতোরে অনল-শিখা পরশে গগন,
এলোকেশে দলে দলে
হাসিমুখে কুতূহলে
ঢালে কুণ্ডে নবনীত কায়!—
কে হেন মরিতে পারে কৌতুকে খেলায়!

সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই মাতা বা স্ত্রী পুরুষকে সৎকর্ম্মে উদ্বোধিত করেন। এদেশে ও বিদেশে যাঁহারা বড়লোক হইয়াছেন, হয় তাঁহাদের মাতার না হয় তাঁহাদের স্ত্রীর (অনেক স্থলে উভয়েরই) শিক্ষা, সাহায্য ও উদ্দীপনাই তাঁহাদের সাধু-কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়াছে। শৈশবে সুমাতার দ্বারা

শিক্ষিত হইলে এবং যৌবনে প্রেমময়ী জায়ার উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভ করিলে যে কোন লোকই অসাধারণ গুণের প্রকাশে দেশকে মুগ্ধ করিতে পারেন। নারীই মহত্ত্বের জননী, দেশ-সেবায় কর্ম্ম-শক্তি। এই দেশেও এক সময়ে নারী মাতা-ও স্ত্রীরূপে স্বদেশরক্ষার জন্য পুরুষকে যোদ্ধৃবেশে সাজাইয়াছেন, উদ্দীপিত করিয়াছেন এবং প্রয়োজন হইলে

এই আর্য্যভূমে বাঁধিয়া কুন্তল,
ধরিয়া কৃপাণ কামিনী সকল,
প্রফুল্ল স্বাধীন পবিত্র অন্তরে,
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ছুটিত সমরে ;
খুলে কেশপাশ দিত পরাইয়া
ধনুর্দ্দণ্ডে ছিলা আনন্দে ভাসিয়া,
সমর উল্লাসে অধৈর্য্য হ'য়ে।

সে সময় ভারতের গৌরব-সূর্য্য একেবারে অস্তমিত হয় নাই। কিন্তু যেদিন হইতে নারী-শক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে, আমাদের মাতা স্ত্রী মূঢ়-ভয়ে

কাতরা হইয়াছেন, সেইদিন হইতে ভারতের দুর্দ্দশা ক্রমে চরমে উঠিয়াছে। পুনরায়—

না জাগিলে যত ভারত ললনা

এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা।

তাই বাংলার নারী, তোমাদের নিকট কাতর নিবেদন—তোমরা শুধু স্নেহে প্রেমে অন্ধ হইয়া থাকিলে দেশের দুর্দ্দশা, আমাদের হীনাবস্থা ঘুচিবে না, বরং দিন দিন এই দুর্দ্দশা বাড়িয়া যাইবে। তোমরা ভগবতীর জীবন্ত বিগ্রহ। কখনও তোমাদের বরাভয়দায়িনী ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী দুর্গা, আর কখনও অসুরদলনী করালী কালী হইতে হইবে। স্বামী বা পুত্রকে স্নেহদানে যেমন তোমরা কুসুম অপেক্ষা কোমলতা দেখাইয়া থাক, তেমনি তাহাদের কর্ত্তব্যে উদ্বোধিত করিতে সেই তোমাদিগকেই বজ্রাপেক্ষাও কঠোর হইতে হইবে, দেশসেবায় তাহাদিগকে সহায়তা করিতে হইবে। তোমাদিগকে পুনরায় শক্তির আসন গ্রহণ করিতে হইবে। মাতা ও স্ত্রীরূপে ভারতের নারী কি করিয়া স্বামীর জন্য, সতীত্বের জন্য, দেশের

স্বাধীনতার জন্য নারীজনোচিত কোমলতা ও ভয় পরিহার করিয়া আত্মবলি দিয়াছেন, কর্ত্তব্যচ্যুত পুরুষকে কঠিন-হৃদয়ে শাসন করিয়া কর্ত্তব্য-পথে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, তাহার এই সামান্য কয়টি ক্ষুদ্র কাহিনী হইতে তোমরা জীবনের আদর্শ গ্রহণ করিবে এই প্রার্থনা।

এখন নারীকে যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবিত হইতে হইবে না। কিন্তু মাতারূপে সন্তানকে দেশসেবায় শিক্ষিত ও উদ্বোধিত করিতে হইবে এবং স্ত্রীরূপে স্বামীর সহিত দেশসেবার ব্রত লইয়া সমস্ত দুঃখকষ্টকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে থাকিয়াই তোমরা মায়ের বন্ধন-মোচনের আয়োজন কর। ভগবান তোমাদের আশীর্ব্বাদ করিবেন, ভারতমাতা প্রসন্না হইবেন, দেশের জন্য সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, জগতের অদ্বিতীয় মহাপুরুষ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর আশা পূর্ণ হইবে।

জাগো, শক্তিময়ী নারী, জাগো।

ভারতের ভবিষ্যৎ তোমাদের ক্রোড়ে অবস্থিত, কারণ তোমারই ভবিষ্যৎ বংশীয়দিগকে মানুষ করিবে। তোমরা ইচ্ছা করিলে ভারত-সন্তানগণকে সরল, ধর্ম্মভীরু এবং সাহসিক নরনারী করিয়াও গড়িয়া তুলিতে পার, অথবা জীবন-সংগ্রামে সম্মুখীন হইতে অক্ষম দুর্ব্বলজীবে পরিণতও করিতে পার।

—মহাত্মা গান্ধী।

ভারতের বীরাঙ্গনা

পদ্মিনী

রাজপুতনার অন্তর্গত মিবারের রাজধানী চিতোর হিন্দু-ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের স্থল—কত শত যুদ্ধে এখানে হিন্দুর বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। চিতোর দেশ-প্রেমিকের তীর্থভূমি। ইহার প্রতিপদক্ষেপে কোনও না কোনও মহাবীরের রক্তরঞ্জিত স্মৃতিচিহ্ন আছে।

ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে চিতোরে রাণা লক্ষ্মণসিংহ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। রাণা নিতান্ত বালক; প্রতিনিধিরূপে খুড়া ভীমসিংহ সমস্ত রাজকার্য্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। সিংহলের রাজা হামিরশঙ্খের কন্যা অপরূপ লাবণ্যময়ী পদ্মিনী ভীম-সিংহের পত্নী। পদ্মিনীর অসাধারণ রূপের খ্যাতি রাজঅন্তঃপুর ছাড়াইয়া সমগ্র চিতোরে, চিতোর

ছাড়াইয়া সমগ্র মিবারে এবং ক্রমে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ভগবানের বিধানে পরে তাঁহার অপূর্ব্ব গুণরাশির খ্যাতি—তাঁহার তেজস্বিতা ও সতীত্ব-গৌরব—সেই নশ্বর রূপকে ছাড়াইয়া দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করিয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

এসময়ে দিল্লী পাঠানের অধিকারে; প্রবল-পরাক্রান্ত সম্রাট আলাউদ্দিন খিল্‌জি ইহার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। রাজপুত-রাণী পদ্মিনীর রূপের কাহিনী তাহার কর্ণে পৌঁছিল। হিন্দু-সতীর অপরূপ রূপের খ্যাতি দুর্দ্দান্ত পাঠান সম্রাটের মনে পাপ-বাসনা জাগাইল। পদ্মিনীকে লাভ করিবার আশায় আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করিলেন। তাহার প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ হইল; কিন্তু বীর পুত্রগণের রক্তপাতে মিবার দুর্ব্বল হইয়া পড়িল।

আলাউদ্দিন শীঘ্রই পুনরায় চিতোর আক্রমণ করিলেন। বহুদিন ধরিয়া যুদ্ধ হইল। মিবাররাজ্য ক্ষুদ্র, কিন্তু রাজপুতেরা সকলেই বীর এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ;

আলাউদ্দিন সৈন্যবলে ও অর্থবলে মহাপরাক্রান্ত, তাহার পাঠান সৈন্যেরাও মহাবীর। বহুদিনের যুদ্ধে উভয় পক্ষই ক্লান্ত ও হীনবল হইয়া পড়িলেন। তখন সন্ধির প্রস্তাব হইল। আলাউদ্দিনই প্রথমে প্রস্তাব করিলেন—তিনি জানাইলেন, পদ্মিনীকে একবার দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিলেই তিনি চিতোর পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। আলাউদ্দিনের প্রস্তাবে রাজপুতসিংহ ভীমসিংহ জ্বলিয়া উঠিলেন—ইহা কখনই হইতে পারে না, বিধর্ম্মীর পাপ-দৃষ্টির সমক্ষে রাজপুত-লক্ষ্মী কখনই বাহির হইতে পারেন না। কিন্তু মিবার তখন রক্তমোক্ষণে দুর্ব্বল, দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে একান্ত ক্লান্ত।

ভীমসিংহ পত্নী পদ্মিনীর পরামর্শ চাহিলেন। পদ্মিনী অতি কোমলহৃদয়া; মিবারের প্রজাপুঞ্জ তাঁহার সন্তানতুল্য; তাঁহার জন্যই যুদ্ধে শত শত মিবার-বীরের প্রাণ বিনষ্ট হইতেছে জানিয়া তিনি অন্তরে অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিতেছিলেন। এখন ভীম-সিংহকে তিনি বলিলেন, "আমার জন্য মিবারের বীরগণ

প্রাণত্যাগ করিতেছেন এ অতি মর্ম্ম-পীড়াদায়ক। আলাউদ্দিন যদি আমার এই ছার রূপ দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া যায়, তবে তাহাই হউক। কিন্তু এ প্রাণ থাকিতে কখনই পাপীর লোলুপ-দৃষ্টির সম্মুখে বাহির হইতে পারিব না; যদি মুকুরে প্রতিবিম্ব দেখিয়া সে সন্তুষ্ট হয়, তবে রাজী আছি। এই সামান্যা নারীর জন্য মিবার বীরশূন্য হইতে চলিয়াছে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না।" ভীমসিংহ পদ্মিনীর কথা সমীচীন বলিয়া মনে করিলেন।

আলাউদ্দিনকে পদ্মিনীর প্রস্তাব জানান হইল। তিনিও অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইলেন। দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া আলাকে রাজপুরীতে নিমন্ত্রণ করা হইল। রাজপুতবীর কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করেন না, ইহা নিশ্চয় জানিয়া পাঠান-সম্রাট বিশেষরূপে রক্ষি-পরিবৃত না হইয়াই রাণার আবাসে প্রবেশ করিলেন এবং যথাসময়ে মুকুরে পদ্মিনীর অলোক-সামান্য স্বর্ণকান্তি দেখিয়া মুগ্ধ ও লালসা-কাতর-হৃদয়ে ফিরিলেন। ভীমসিংহ অতিথিকে বিদায় দিতে

চিতোর-দুর্গের বহিঃসীমা পর্য্যন্ত আসিলেন। বিশ্বাসে তিনি নিজেকে পাঠানের অপেক্ষা ছোট করিতে পারেন না; তাঁহার সঙ্গেও কোন সৈন্যসামন্ত আসিল না। দুষ্ট পাঠানও ইহাই আশা করিয়াছিলেন। এই স্থানে কতকগুলি পাঠান-সৈন্য লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। তাহারা ভীমসিংহকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বন্দী করিয়া লইয়া গেল; পদ্মিনী আত্ম-সমর্পণ করিলে তবে ছাড়িবে।

চিতোরবাসীর মস্তকে বজ্রাঘাত হইল; প্রাণ থাকিতে রাজপুত নারীর অসম্মান হইতে দিতে পারে না, অথচ তাহা না হইলে মিবারের প্রাণ ভীমসিংহের বৃথা প্রাণ যায়। এ বিপদেও পদ্মিনী, নিতান্ত কাতরা হইলেও, ধৈর্য্য হারাইয়া অবসন্ন হইয়া পড়েন নাই। তিনি তাঁহার খুড়া গোরা ও ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বাদশ-বর্ষীয় বালক বাদলের সহিত পরামর্শ করিয়া আলাউদ্দিনের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—“পাঠান-সম্রাট অবরোধ উঠাইয়া লইলে আমি স্বামীর মুক্তির জন্য আত্মসমর্পণ করিব। কিন্তু আমি

রাজস্থান-গৌরব মিবার-রাজবংশের রাণী, সম্রাটকে আমার গৌরব রক্ষা করিতে হইবে। আমার অনুগামিনী হইয়া দিল্লীতে যাইবার জন্য আমার বহুসংখ্যক সহচরী ও দাসীরা গমন করিবে এবং আরও বহুতর চিতোরবাসিনী আমাকে শেষ-বিদায় দিবার জন্য শিবির পর্য্যন্ত গমন করিবে। এই সমস্ত রাজপুতানীর সম্মান ও পবিত্রতা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সে জন্য সম্রাট যেন নিজের সৈন্যগণকে আমার গমন-পথ হইতে দূরে থাকিতে আদেশ দেন। আর আত্ম-সমর্পণের পূর্ব্বে স্বামীর সহিত সামান্য সময়ের জন্য কারাগারে একবার শেষ-দেখা করিতে ইচ্ছা করি। সেখানেও যেন কোন সৈন্য বা প্রহরী থাকিয়া আমার সম্মানের হানি না করে। রাণী আমি; সম্রাটের নিকটও যেন রাণীর মতই ব্যবহার পাই।”

আলাউদ্দিন আহ্লাদে আত্মহারা হইলেন। তাহার বহুদিনের কামনার ধন, লালসার বস্তু রমণীরত্ন অবশেষে হস্তগত হইবে মনে করিয়া দুর্ব্বৃত্ত সম্রাট বিচারবুদ্ধি সম্পূর্ণ হারাইয়া বসিলেন। রাজপুত

নারী সুখ-ঐশ্বর্য্য সমস্ত ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু সতীধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না—এই ধর্ম্ম তাঁহার নিকট প্রাণের বিনিময়েও বাঞ্ছনীয়, ইহা তাহার একবারও মনে হইল না। স্বামীর জন্য, দেশের গৌরবের জন্য রাজপুতনারী কতদূর দুঃসাহসিকা হইতে পারেন, তাহা বোধ হয় তাহার জানা ছিল না। তিনি রাজপুত-নারীর অলৌকিক রূপই দেখিয়াছিলেন, সেই রূপের বাড়া তাঁহার তেজস্বিতার খবর রাখিতেন না। আনন্দে তিনি পদ্মিনীর সমস্ত প্রস্তাবে সম্মত হইয়া যথাযথ ব্যবস্থা করিলেন। দিন স্থির হইল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে পদ্মিনী পাঠান-শিবিরে গমন করিলেন, সঙ্গে সাত শতাধিক শিবিকা। পদ্মিনী নিজে অসিচর্ম্মে যোদ্ধৃবেশে সজ্জিতা হইয়া গিয়াছিলেন। অন্য শিবিকাগুলির প্রত্যেকখানিতে এক একজন চিতোরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রণপণ্ডিত বীর, যোদ্ধৃবেশের উপর স্ত্রীবেশে সজ্জিত। শিবিকাগুলি বহন করিতেছিলেন ছয় ছয়জন করিয়া গুপ্তভাবে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বাহক-বেশধারী রাজপুত যোদ্ধা। পদ্মিনীর গমনপথে

কোথাও কেহ সন্দেহ করিবার ছিল না; সম্রাটের আদেশে সৈন্যসামন্ত দূরে অবস্থিতি করিতেছিল। শিবিকাগুলি আসিয়া শিবিরে প্রবেশ করিল। স্বামীর নিকট বিদায় লইবার জন্য পদ্মিনী মাত্র অর্দ্ধঘণ্টার সময় পাইলেন। তিনি কারাকক্ষে প্রবেশ করিয়াই স্বামীকে নিজের মন্ত্রণার কথা জানাইলেন এবং তদ্দণ্ডেই তাঁহাকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া লইয়া অন্য কতকগুলি শিবিকার সহিত প্রস্থান করিলেন। অধিকাংশ শিবিকাই পদ্মিনীর সহিত দিল্লীতে যাইবার ছলে রহিয়া গেল। এদিকে যে পদ্মিনী স্বামীর সহিত শত্রু-শিবির ত্যাগ করিলেন, তাহা কেহ সন্দেহ করিতে পারিল না। সকলেই মনে করিল—যে সমস্ত চিতোরবাসিনীর বিদায়ান্তে ফিরিয়া যাইবার কথা তাহারাই যাইতেছে। তাঁহাদের পথ হইতে সৈন্য-সামন্ত দূরে রহিল। কিয়দ্দূরে দুইটি উৎকৃষ্ট অশ্ব সজ্জিত ছিল। স্বামীর সহিত পদ্মিনী শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া তাহাতেই আরোহণ করিয়া চিতোরাভিমুখে ছুটিলেন।

এদিকে যত সময় যাইতে লাগিল আলাউদ্দিন ততই উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিতে লাগিলেন—পদ্মিনী আর আসেন না। আলার ইচ্ছা ছিল না যে ভীমসিংহকে ছাড়িয়া দেন। পদ্মিনী অনর্থক দীর্ঘ সময় স্বামীর সহিত কাটাইতেছেন মনে করিয়া তাহার ঈর্ষানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি স্বয়ং কারাকক্ষে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কারাগার শূন্য। আলার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। তিনি আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া "হর হর মহাদেও" শব্দে রাজপুতবীরগণ পাঠান-সৈন্য আক্রমণ করিলেন। আলাউদ্দিন একেবারে অপ্রস্তুত ছিলেন না। পলায়িত রাজ-দম্পতির পশ্চাদ্ধাবন করিবার জন্য সৈন্যগণের প্রতি আদেশ দিলেন। তখন সেখানে পাঠানে রাজপুতে তুমুল যুদ্ধ বাধিল।

এই অবসরে পদ্মিনী ও ভীমসিংহ চিতোর-দুর্গের দ্বারদেশে পৌঁছিলেন। সেখানে আলার পাঠান-সৈন্য তাঁহাদের আক্রমণ করিল। বীর-বালক বাদল

ও গোরার নেতৃত্বে রাজপুতগণ তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিলেন। ভীষণ যুদ্ধে পাঠানসৈন্য বিধ্বস্ত হইয়া গেল। রাজপুতের তেজস্বিতায় অবশিষ্ট সৈন্যগণ ভীতিকাতর হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া ব্যর্থমনোরথ আলা ক্ষুন্নমনে চিতোর পরিত্যাগ করিলেন।

এই যুদ্ধে চিতোরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরগণের অধিকাংশ মরণ আলিঙ্গন করিলেন। পাঠান-সৈন্য-শ্রেণীতে ধ্বংস-লীলা করিয়া শত্রুশবে বেষ্টিত হইয়া শত্রুশবে শির রাখিয়া বীরবর গোরা প্রাণত্যাগ করিলেন। বাদল ভীষণরূপে আহত হইয়া রাজপুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। গোরার সুযোগ্য সহধর্ম্মিণী পূর্ব্বেই স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছিলেন। এখন বাদলের মুখে তাঁহার অপূর্ব্ব বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া "আমার প্রিয়তম আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, বিলম্ব হইলে ভৎর্সনা করিবেন" বলিয়া, সকলের নিকট বিদায় লইয়া, হাসিমুখে চিতারোহণ করিলেন।

কয়েক বৎসর গত হইল। আলাউদ্দিন শক্তি-সংগ্রহ করিয়া পুনরায় চিতোর আক্রমণ করিলেন। পদ্মিনীর রূপের কথা, তাঁহার কৌশলে ও সাহসিকতায় নিজের পরাজয়ের কথা, রাজপুত-বীরের হস্তে পাঠানের নিগ্রহের কথা তিনি ভুলেন নাই; তাহার মনে প্রতিহিংসার আগুন অবিরত জ্বলিতেছিল। এবার চিতোরের ধ্বংস নিশ্চিত করিবার জন্য তিনি বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া আসিয়াছিলেন। মিবার তখনও পূর্ব্ব আক্রমণের ক্ষতি সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। আলা অনায়াসেই চিতোরের দক্ষিণ ভাগে একটি পাহাড় অধিকার করিয়া বসিলেন। মিবারবাসী এবারও প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; শত শত রাজপুতবীর স্বদেশের জন্য প্রাণ-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকলেই বুঝিলেন, আর বেশীদিন নহে—শীঘ্রই চিতোর বীরশূন্যা হইয়া শত্রু পদানত হইবে।

প্রবাদ, এই সময়ে একদিন রাণা গভীর রজনীতে শয্যায় পড়িয়া চিতোরের এই ভয়াবহ দুর্দ্দশায় নিজের

দ্বাদশপুত্রের অন্ততঃ একজনেরও প্রাণ বাঁচাইবার কোনও উপায় করিতে পারেন কিনা ভাবিতেছেন, এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন মেঘমন্দ্রস্বরে ধ্বনিত হইল—"মঁয় ভুখা হুঁ" (আমি ক্ষুধিত)। বিস্মিত-চক্ষু তুলিয়া প্রদীপের অস্পষ্ট আলোকে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে দেখিতে পাইয়া তিনি বলিলেন, "মাগো, আমার আট হাজার আত্মীয় ও জ্ঞাতিকে বলিরূপে গ্রহণ করিয়াও তোমার ক্ষুধা মিটিল না ?"

দেবী কহিলেন, "আমি রাজবলি চাই। দ্বাদশজন মুকুটধারী ব্যক্তি চিতোরের জন্য রক্তপাত না করিলে মিবার হইতে তোর বংশের অধিকার লোপ পাইবে।"

পরদিন রাণা সর্দ্দারগণকে ডাকিয়া সমস্ত কথা বলিলেন। তাঁহারা রাজাজ্ঞায় ইহার সত্যতা পরীক্ষার জন্য রাত্রে রাজপ্রাসাদে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পুনরায় দেবী আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, "মিবারের সহস্র সহস্র সাধারণ অধিবাসী রক্তপাত করিয়াছে; কিন্তু তাহাতে আমার তৃপ্তি নাই।

প্রতিদিন একজন রাজপুত্র রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া তিন দিন রাজ্য-পরিচালনা করুক্ এবং চতুর্থদিনে যুদ্ধে শত্রুহস্তে প্রাণবিসর্জ্জন করুক্। এইরূপে দ্বাদশজন রাজপুত্রের প্রাণ-বলি পাইলে তবে আমার তৃপ্তিসাধন হইবে।”

এ প্রবাদ হয় ত পরবর্ত্তী কালের কবি-কল্পনা, হয় ত বা বিশ্বাসপ্রবণ সরল রাজপুত-বীরগণকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তখনই প্রচারিত। যাহা হউক, রাণার দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিবার জন্য পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা হয়। জ্যেষ্ঠপুত্র অরিসিংহ সর্ব্বপ্রথম প্রাণত্যাগ করেন। মধ্যমপুত্র অজয়সিংহ পিতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। পিতার অনুরোধে তিনি তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাগণকে এই আত্মাহুতির প্রতিযোগিতায় তাঁহার পূর্ব্বে অগ্রসর হইতে দিলেন। একে একে একাদশজন রাজপুত্র প্রাণত্যাগ করিলেন—অবশিষ্ট রহিলেন একমাত্র অজয়সিংহ, তখন প্রাণ-বিসর্জ্জনের অধিকার লইয়া পিতা-পুত্রে প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইল।

অবশেষে রাণা বংশলোপ হইবে বলিয়া অনেক বুঝাইয়া অজয়সিংহকে নিরস্ত করিলেন এবং স্বয়ং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। অজয়সিংহ কয়েকজন অনুচর লইয়া শত্রুসৈন্য ভেদ করিয়া কৈলবারায় প্রস্থান করিলেন।

এখন রাণা প্রাণত্যাগ করিলেই চিতোর নিশ্চিত পাঠানের হস্তগত হইবে। রাজপুত-রমণীগণের সতীধর্ম্ম রক্ষার জন্য কেহ থাকিবে না। কিন্তু রাজপুতনারী সমস্ত ত্যাগ করিতে পারে, পারে না কেবল ঐ একটি জিনিষ। তাই ভীষণ "জহরব্রতের" আয়োজন হইল। দুর্গাভ্যন্তরস্থ গাঢ় অন্ধকারময় এক বৃহৎ গুহার মধ্যে অগ্নি-শিখা লক্ লক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। গৌরবিনী পদ্মিনী সমস্ত চিতোর-বাসিনী রাজপুতানীদের সঙ্গে লইয়া হাসিমুখে সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে সব শেষ হইল।

রাণা ও রাজপুত-বীরগণ নিস্পন্দদেহে দাঁড়াইয়া নিস্পলকনেত্রে আপন আপন স্নেহের ধন মাতা,

জায়া, কন্যা, ভগ্নীকে ভস্মীভূত হইতে দেখিতেছিলেন। অবশেষে ভীমসিংহের কণ্ঠ গর্জ্জিয়া উঠিল—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ?
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায় ॥
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে,
বাহুবল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার ॥
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে,
চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে,
তুল্য তার নাই ॥"

ভীমসিংহের বাক্যে নিস্পন্দ দেহে প্রাণ পাইয়া রাজপুত বীরগণ দুর্গদ্বার খুলিয়া সকলে একযোগে মুক্ত অসিহস্তে পাঠান-সৈন্যের উপর ঝাপাইয়া পড়িলেন। শত শত পাঠান প্রাণত্যাগ করিল। একে একে তাঁহারাও সকলে রণভূমে শেষ-শয্যা গ্রহণ করিতে লাগিলেন—যুদ্ধান্তে একজনও রাজপুত জীবিত রহিলেন না।

বহুদিনের বহু চেষ্টার পর আলাউদ্দিন চিতোর-দুর্গে প্রবেশ করিলেন। দুর্গ তখন নীরব, নিস্পন্দ, প্রাণিহীন। গুহা হইতে তখনও রাজপুত-নারীগণের ভস্মাবশেষ দেহ হইতে পবিত্র ধূম বিনির্গত হইতেছে। পদ্মিনীর রূপের জ্যোতি তখন আর চিতোর আলোকিত করিয়া নাই। কিন্তু তাঁহার সতীধর্ম্মের সৌরভ, তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও তেজস্বিতার গৌরব প্রাণিহীন চিতোরকে উজ্জ্বলতর করিয়া রহিয়াছে। সেই পবিত্র শ্মশানে সসৈন্য আলাউদ্দিন প্রেতের ন্যায় প্রতিভাত হইলেন।

তারাবাই

রাজপুতনায় টোডা নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রাও শূরতান নামক একজন তেজস্বী পুরুষ সেখানে রাজত্ব করিতেন। টোডা অতি ক্ষুদ্র রাজ্য; সৈন্যবল ও অর্থবলে প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমানগণের সমকক্ষ নহে। লিল্লা নামক একজন পরাক্রমশালী দুর্দ্দান্ত পাঠান এই ক্ষুদ্র রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। রাও শূরতান নিজ রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া আরাবল্লী পর্ব্বতের পাদদেশে মিবারের অন্তর্গত বেদনোরে আসিয়া বাস করেন।

রাও শূরতানের পুত্র ছিল না, একটি মাত্র কন্যা—নাম তারাবাই। তারা অপরূপ রূপসী, অভূতপূর্ব্ব তেজস্বিনী; তাঁহার ঝলমল রূপে কত রাজপুত-পতঙ্গ আকৃষ্ট হইত, তাঁহার অলোকসামান্য তেজস্বিতায় মোহাকৃষ্ট দূরে রহিত। পিতার ভাগ্য

পরিবর্ত্তনে রূপসী তারার হৃদয়ে আগুন জ্বলিল। তিনি পিতার একমাত্র সন্তান। পিতাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বংশ-গৌরব রক্ষা করা তাঁহারই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইল। রাজপুতনা বীরকীর্ত্তি-মণ্ডিত দেশ; পুরুষের ত কথাই নাই, কত কত কুসুমকোমলা নারী এখানে অলৌকিক বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কাহিনী শ্রবণে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি নিজ কর্ত্তব্য-পালনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি স্ত্রীবেশ পরিত্যাগ করিয়া যোদ্ধৃ-পুরুষের বেশ ধারণ করিলেন, যুদ্ধাশ্ব-পরিচালনায় দক্ষতা লাভ করিলেন, শরসন্ধানে এমন পটুতা অর্জ্জন করিলেন যে তীরবেগে ধাবিত হইয়াও তাঁহার লক্ষ্য ব্যর্থ হইত না। হস্তে ধনু এবং পৃষ্ঠে তূণীর ধারণ করিয়া যখন তিনি সাক্ষাৎ রণদেবতার ন্যায় আরাবল্লীর গিরিপথে ছুটিতেন, তখন সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইত। এই বেশে সৈন্যসামন্তগণের সহিত টোডা উদ্ধার করিবার ব্যর্থ চেষ্টাও তিনি কয়েকবার করিলেন।

বীর্য্য ও রূপের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে সাক্ষাৎ দুর্গারূপিণী

বেদনোরের এই তারাকে অনেক রাজপুত বীর যুবকই বিবাহ করিতে একান্ত ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু, "যে পাঠানের হস্ত হইতে টোডা উদ্ধার করিয়া দিবে তাঁহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমি পতিত্বে বরণ করিব না" তাঁহার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাঁহাদের নিরাশ করিয়া ফিরাইয়া দিত। তাঁহার প্রতিজ্ঞার সহিত রাও শূরতানও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "টোডা উদ্ধারকারী ভিন্ন অন্য কাহাকেও কন্যা দান করিব না।" নিঃসম্বল শূরতান জানিতেন অন্যের সাহায্য ভিন্ন সমস্ত বীরত্ব ও তেজস্বিতা সত্ত্বেও তিনি বা তাঁহার কন্যা পরাক্রমশালী পাঠানের হস্ত হইতে টোডা উদ্ধার করিতে পারিবেন না এবং সেইজন্যই তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা।

রাও শূরতান যখন সপরিবারে বেদনোরে আসিয়া বাস করেন, তখন রাণা রায়মল্ল মিবারে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ সঙ্গ বা সংগ্রাম সিংহ, মধ্যম পৃথ্বীরাজ এবং কনিষ্ঠ জয়মল্ল। ইঁহাদের মধ্যে বীরত্বে ও তেজস্বিতায় পৃথ্বীরাজ

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; রাজপুতনায় তখন তাঁহার সমকক্ষ বীর আর কেহ ছিলেন না। কিন্তু তিনি অত্যন্ত উগ্র-মস্তিষ্ক হঠকারী ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহার হঠকারিতায়ই তিন ভ্রাতায় ভীষণ বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ সংগ্রামসিংহের বীরত্বের সহিত ধীরতার মিলন ছিল ; তিনি ভ্রাতার হস্তে প্রাণ-নাশের ভয়ে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশে পলায়ন করিয়াছিলেন। রায়মল্ল মধ্যম পুত্রের এই অত্যাচারে ব্যথিত ও রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পৃথ্বীরাজ মারবার রাজ্যে যাইয়া বাস করিতেছিলেন। এই নির্ব্বাসন-কালেও তিনি অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া অনেক বীর যুবককে নিজের অনুচররূপে লাভ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের অপসারণে এ সময়ে জয়মল্লই চিতোরের যুবরাজ।

যুবরাজ জয়মল্ল পিতৃরাজ্যে উদিত বেদনোরের উজ্জ্বল তারাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন—তাঁহাকে

লাভ করিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বয়ং যাইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। তারা বলিলেন, "আগে টোডা উদ্ধার করুন্, আমি আপনার করেই আত্ম-সমর্পণ করিব।" জয়মল্ল এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু তাঁহার আর দেরী সহিতেছিল না। তিনি লালসা-পরবশ হইয়া, স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার চেষ্টা না করিয়াই, বলপূর্ব্বক তারাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন তাঁহার পিতৃরাজ্যে আশ্রিত নিঃসম্বল শূরতানের তাঁহাকে বাধা দিবার সাহস বা ক্ষমতা হইবে না। কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না—তারাকে তাঁহার ভাগ্যাকাশের তারারূপে লাভ করা তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না। তেজস্বী শূরতান নিজের, কন্যার ও বংশের এ অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্ধত যুবরাজকে হত্যা করিলেন। সংগ্রামসিংহ ও পৃথ্বীরাজের তখন সংবাদ নাই; সকলেই জানে জয়মল্লই রাণার একমাত্র উত্তরাধিকারী। বন্ধুগণ এই বংশধর পুত্রের হত্যার প্রতিশোধ লইতে

পরামর্শ দিলে উদার-হৃদয় ন্যায়বান রাণা উত্তর করিলেন—‘যে বিপন্ন পিতার অপমান করিয়া কন্যাহরণে উদ্যত হয় এ তাহার উপযুক্ত শাস্তি।” রাণা শুধু ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না। তিনি পুত্রকৃত কলঙ্ক হইতে স্বীয় বংশকে নির্ম্মুক্ত রাখিবার জন্য ও শূরতানের তেজস্বিতার পুরস্কার-স্বরূপ তাঁহাকে বেদনোর প্রদেশের ভূমিস্বত্ব দান করিলেন।

ইতি মধ্যে পৃথ্বীরাজ তাঁহার বীরত্বপূর্ণ কার্য্যবলীর খ্যাতিদ্বারা পিতার বিনষ্ট স্নেহ অল্পে অল্পে আকর্ষণ করিতেছিলেন। স্থান বিশেষের বিদ্রোহ দমন করিয়া এখন তিনি পিতার নিকট সম্পূর্ণ ক্ষমা লাভ করিলেন। জয়মল্লের মৃত্যুর পর রাণা তাঁহাকে রাজধানীতে আহ্বান করিয়া পুনরায় পূর্ব্বস্নেহে গ্রহণ করিলেন। তিনি এখন শুধু যুবরাজ নহেন, রাজপুতনার শ্রেষ্ঠ বীর; শত শত বীর যুবক তাঁহার অনুরক্ত সহচর। তাঁহার বীর-খ্যাতি মিবারের সীমা অতিক্রম করিয়া সমগ্র রাজপুতনায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। চারণ কবিগণ তাঁহার বীরত্ব-কাহিনী গাহিয়া

বেড়াইতেন। তিনি তখন শৌর্য্য-প্রিয় রাজপুতগণের প্রাণের আরাধ্য। তাঁহাকে ফিরিয়া পাইয়া বীরগণের চিরপ্রিয় চিতোর নবজীবন লাভ করিল। বীরশ্রেষ্ঠ পৃথ্বীরাজও জন্মভূমির ক্রোড় অধিকার করিয়া নিজের সমস্ত বীরত্ব সার্থক মনে করিলেন— তাঁহার হৃদয়ে উৎসাহ-অনল দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল।

চিতোরে ফিরিবার অনতিকাল পরেই পৃথ্বীরাজ বেদনোরবাসিনী তারার কাহিনী অবগত হইলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব কথা শুনিয়া তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তারাও পৃথ্বীরাজের যশঃ-সৌরভে তাঁহার প্রতি যথেষ্ট আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; এখন তাঁহার ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া অন্তরের অন্তরে তাঁহাকেই সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিলেন। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই পৃথ্বীরাজ রাও শূরতানের নিকট তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণের আবেদন জানাইলেন। শূরতান এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন; আর তারা-ত পূর্ব্বেই আত্মনিবেদিতা হইয়াছিলেন। কিন্তু উভয়েই তাঁহাদের প্রতিজ্ঞার

কথা পৃথ্বীরাজকে জানাইলেন—তারাকে লাভ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে টোডা উদ্ধার করিতে হইবে। সর্ব্বদা যুদ্ধাভিলাষী বীর পৃথ্বীরাজের নিকট এত আনন্দের কথা—তিনি আগ্রহসহকারে সম্মত হইলেন।

পৃথ্বীরাজ যুদ্ধগমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তারাবাইও তাঁহার অনুগামিনী হইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জন্মভূমি উদ্ধার করিবার জন্য স্বহস্তে যুদ্ধ করা তিনি গৌরব ও আনন্দময় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার তিনি যুদ্ধে যোগদানও করিয়াছিলেন। এ যুদ্ধে গমন-ত অধিকতর আনন্দের, একান্ত বাঞ্ছনীয়। যাঁহাকে প্রাণমন সমস্ত সমর্পণ করিয়াছেন, যাঁহার চরণে নিবেদিত হইবার জন্য হৃদয়ে প্রেমপুষ্প সৌরভিত হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মুক্ত অসিহস্তে যুদ্ধ করা, তাঁহার বিপদের অংশগ্রহণ করা বীররমণী সতী তারার নিকট জীবনের শ্রেষ্ঠসুখ বলিয়া মনে হইল। শূরতান কন্যাকে জানিতেন;

তাঁহার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া নিঃসন্দেহচিত্তে সম্মতি দান করিলেন। আর পৃথ্বীরাজের-ত কথাই নাই—এরূপ প্রেমময়ী অথচ যুদ্ধনিপুণা ও বুদ্ধিমতী সঙ্গিনী লাভ ত নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয়।

মহরম উৎসবের সময় টোডা আক্রমণ করা স্থির হইল পৃথ্বীরাজ নিজের সৈন্যশ্রেণী হইতে পাঁচশত বীরপুরুষকে সঙ্গে যাইবার জন্য নির্ব্বাচিত করিলেন। কিন্তু এই সামান্যসংখ্যক সৈন্য লইয়া দুর্দ্দান্ত পাঠানের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভবপর নয়। অতএব স্থির হইল পাঠানসর্দ্দারকে আগে কৌশলে হত্যা করিতে হইবে।

মহরমের দিন তাজিয়া বাহির হইয়াছে এমন সময়ে তাঁহারা টোডা পৌঁছিলেন। সৈন্যগণকে নগরদ্বার হইতে কিছুদূরে রাখিয়া পৃথ্বীরাজ, তারাবাই এবং পৃথ্বীরাজের নিয়ত-সঙ্গী সঙ্গর-সর্দ্দার অশ্বারোহণে নগরে প্রবেশ করিলেন। দলে দলে মুসলমানগণ তাজিয়া লইয়া উৎসবে মাতিয়া দুর্গে প্রবেশ করিতে লাগিল তাঁহারা তিনজনে ইহার একটি দলে মিশিয়া

গেলেন। তাজিয়া রাজপ্রাসাদের নিকট দিয়া যাইতে লাগিল। প্রাসাদের বারান্দায় লিল্লা উৎসবে যোগ দিবার জন্য বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন। এই তিনজন বিশিষ্ট অশ্বারোহীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহারা কে?" তাহার মুখের কথা মুখে থাকিতে থাকিতেই পৃথ্বীরাজের বর্শা ও তারার বাণে তাহাকে ভূপাতিত করিল। উপস্থিত জনগণ সন্ত্রস্ত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল এবং এই অবসরে তাঁহারা তীরবেগে অশ্বচালনা করিয়া নগরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক প্রকাণ্ড-কায় হস্তী তাঁহাদের পথ অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান। তারাবাই তরবারির এক আঘাতে তাহার শুঁড় কাটিয়া ফেলিলেন; হাতী দূরে পলাইল। নিকটেই তাঁহাদের সৈন্যগণ অপেক্ষা করিতেছিল; তাঁহারা যাইয়া তাহাদের সহিত মিশিলেন।

তখন "হর হর" ভীমনাদে সসৈন্য পৃথ্বীরাজ পাঠানগণকে আক্রমণ করিলেন। নায়কহীন পাঠানসৈন্য সহজেই পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া

পড়িল। মুসলমান-রক্তে রঞ্জিত হইয়া টোডা পুনরধিকৃত হইল। শূরতান পুনরায় নিজ সিংহাসন লাভ করিয়া বীরবর পৃথ্বীর হস্তে যথারীতি কন্যা সমর্পণ করিলেন। তাহার ন্যায় বীর্য্যবতী নারীরত্নের উপযুক্ত পুরুষ সিংহের সহিতই মিলন হইল।

লিল্লার এক ভ্রাতা টোডা পুনরধিকার করিবার চেষ্টা করিয়া প্রাণ হারাইলেন। আজমীরের অধিপতি নবাব মুল্লু খাঁ টোডা হইতে রাজপুতগণকে বিতাড়িত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন জানিয়া পৃথ্বীরাজ আজমীর আক্রমণ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিয়া তাহার দুর্গ অধিকার করিলেন। রাজবারায় পৃথ্বীর খ্যাতি দ্বিগুণিত হইল। সহস্র রাজপুত বীর-গৌরব-আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার নাকাড়া ঘেরিয়া সমবেত হইলেন। আকাশে তাঁহাদের জসি ঝলকিত হইতে লাগিল; তাঁহারা নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ও রক্ষক হইলেন।

বিবাহের পর পৃথ্বীরাজ পত্নীর সহিত কমলমীর দুর্গে বাস করিতে লাগিলেন। এখান হইতে তিনি

কত যুদ্ধে নেতৃত্ব করিয়াছেন; প্রত্যেক যুদ্ধেই স্বামীগত-প্রাণা তারা সঙ্গিনী ছিলেন। কিন্তু এই অপূর্ব্ব বীর দম্পতির জীবনলীলা শীঘ্রই শেষ হইল।

পৃথ্বীরাজ তাঁহার ভগ্নী শিরোহী-পতি পাভুরায়ের পত্নীর নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলেন। তিনি অহিফেনসেবী দুর্ব্বৃত্ত স্বামীর ভীষণ অত্যাচার হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া পিত্রালয়ে লইয়া আসিবার জন্য ভ্রাতার নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছেন। পৃথ্বীরাজ তখনই যাত্রা করিয়া মধ্যরাত্রে শিরোহী পৌঁছিলেন এবং প্রাসাদ-প্রাকার অতিক্রম করিয়া পাভুরায়কে তরবারি-হস্তে আক্রমণ করিলেন। পাভুরায় স্ত্রীর পাদুকা মস্তকে লইয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তবে নিষ্কৃতি পাইলেন। তখন পৃথ্বীরাজ ভগ্নীপতিকে আলিঙ্গন করিয়া বন্ধুভাবে তাঁহার গৃহে পাঁচ দিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।

পাভুরায় কিন্তু অপমান ভুলিলেন না। তিনি এক প্রকার সুন্দর মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে

জানিতেন। তাহার কতকগুলি বিষ মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে পৃথ্বীরাজকে দিলেন। কমলমীর দুর্গ দৃষ্টিগোচর হইলে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পৃথ্বীরাজ এই বিষাক্ত মিষ্টান্ন ভোজন করিলেন। অবিলম্বেই বিষক্রিয়া আরম্ভ হইল। আর অগ্রসর হইতে অশক্ত হইয়া তিনি 'মামা দেবী'র মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। এখান হইতে তারা-বাইকে সংবাদ পাঠাইলেন, "আমার জীবন-দীপ নিভিতে চলিয়াছে; আমার হৃদয়-গগনের তারা একবার আসিয়া শেষ বিদায় দিয়া যাও।" সংবাদ পাইয়া তারাবাই যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থায়ই ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু তাঁহার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সব শেষ হইয়া গিয়াছিল।

তারাবাই সাধারণ রমণীর ন্যায় ক্রন্দন করিয়া শোক প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার স্বামী বীর, যুদ্ধ-পরায়ণ; রণক্ষেত্রে শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, হয়ত তাঁহার পার্শ্বেই যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহার দেহাবসান হইবে ইহা তিনি জানিয়া রাখিয়াছিলেন;

ক্ষত্রিয় রমণীর নিকট স্বামীর এরূপ মৃত্যু গৌরবের। কিন্তু শত্রুর গুপ্ত বিষে তাঁহার প্রাণ যাইবে ইহা তিনি কখনও মনে করেন নাই, সেজন্য প্রস্তুতও ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার মন স্থির করিতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইল না। তিনি স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন, "চিতা সজ্জিত কর। আমি আমার ইহ-জগতের দেবতার সহিত চিতানলে দেহ-বিসর্জ্জন করিয়া স্বর্গে যাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইব।"

চিতা প্রস্তুত হইল। বিধাতার অপূর্ব্ব-সৃষ্টি তারাবাই বীর স্বামীর গতপ্রাণ দেহ বক্ষে ধারণ করিয়া তাহাতে শয়ন করিলেন। আগুন জ্বলিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার নশ্বর দেহের সহিত অতুলনীয় রূপরাশি ভস্মীভূত হইয়া গেল—শুধু যশঃসৌরভে ভারত মুগ্ধ করিয়া নাম অমর হইয়া রহিল।

কর্ম্মদেবী

মিবারের অন্তর্গত কৈলবারার শাসনকর্ত্তা মোগল-শত্রুর সহিত যুদ্ধে শিশু পুত্র রাখিয়া অকালে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার সাধ্বী পত্নী কর্ম্মদেবী একান্ত ইচ্ছা সত্বেও স্বামীর সহিত সহমরণে যাইতে পারিলেন না। তাঁহার প্রিয়তম যে তাঁহার স্কন্ধে প্রবল দায়িত্ব-ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার শিশু পুত্রকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। এ-ত শুধু লালন-পালন করা নয়; রাজপুতের পুত্র যাহাতে তাঁহার উপযুক্ত বীর-গৌরব অর্জ্জন করিতে পারে, যাহাতে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য অকাতরে প্রাণ-বলি দিতে পারে, যাহাতে স্বার্থপরতা বা কোন প্রকারের ক্ষুদ্রাশয়তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান লাভ করিতে না পারে, তাহার মত শিক্ষা তাঁহাকে দিতে হইবে। এ-ত শুধু স্নেহ-দান নয়। শরীর মন উভয় গড়িবার এই যে প্রবল মাতৃ-কর্ত্তব্য ইহা-ত যাহার তাহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া যাওয়া যায় না।

তাই কর্ম্মদেবার সতীগণের আকাঙ্ক্ষিত সহমরণে যাওয়া হইল না ; তাঁহাকে অসহ্য যন্ত্রণা বুকে বহিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইল।

কর্ম্মদেবী তাঁহার কর্ত্তব্য অতি সুন্দররূপে সম্পাদন করিলেন। তাঁহার পুত্র পুত্ত কৈশোরের প্রারম্ভেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন ; কিন্তু সেই অল্প দিনের মধ্যে তিনি বীরাগ্রগণ্য লোক-নেতা বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। এই বালক বীরের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকথা রাজস্থানের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়াছে। তাঁহার বীরত্ব-মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শত্রু নিজ প্রাসাদের সম্মুখে তাঁহার প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। পুত্তের এ গৌরব কাঁহার কৃপায় ? মাতা কর্ম্মদেবীর। তিনি যেমন তাঁহার নশ্বর শরীরের জননী, তেমনি তাঁহার সমস্ত গুণরাশিরও জননী বটে।

১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর পরাক্রান্ত মোগল সম্রাট আকবর শাহ্ চিতোর আক্রমণ করিলেন। চিতোর একরূপ অরক্ষিত। রাণা উদয় সিংহ নিতান্ত

অকর্ম্মণ্য। আকবর মহাপরাক্রমশালী; তখন বিজয়-লক্ষ্মী সর্ব্বত্রই তাঁহার পক্ষগামিনী। এবার চিতোর মুসলমানের হস্তগত হইবে তাহা একরূপ নিশ্চয় জানিয়াও মিবারের দেশ-গত-প্রাণ সর্দ্দারগণ স্বদেশের গৌরব রক্ষার্থ সমবেত হইলেন। বেদনোরের অধিপতি বীরবর জয়মল্ল সেনাপতিপদে বরিত হইলেন।

কৈলবারার অধিপতি মিবারের সামন্ত। রাণার বিপদের সময় তাঁহাকে সাহায্য করা, মিবার শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সসৈন্য যুদ্ধার্থ গমন করা তাঁহার কর্ত্তব্য। এখন সেই কর্ত্তব্য উপস্থিত। কৈলবারার শাসনদণ্ড তখন পুত্রের হস্তে। তিনি ষোল বছরের বালক মাত্র। মাতা কর্ম্মদেবী তাঁহার এই বালক পুত্রকে ডাকিয়া চিতোর-রক্ষার্থ সসৈন্যে যুদ্ধে গমন করিতে আদেশ করিলেন।

মায়ের আদেশে বীর পুত্র কর্ত্তব্য-পালনে অগ্রসর হইলেন। মায়ের চরণধূলি লইয়া তিনি বালিকা-পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বীরের উপযুক্ত পত্নী

কমলাবতী হাসিমুখে উৎসাহবাক্যে স্বামীকে বিদায় দিলেন। তখন তিনি ভগিনী কর্ণবতীর নিকট বিদায় লইতে গেলেন। মহীয়সী জননীর কন্যা, বীরের ভগিনী কর্ণবতী ভ্রাতাকে অধিকতর উত্তেজনা দান করিলেন। মাতার আশীর্ব্বাদ, পত্নীর হৃদয়-ভরা ভালবাসা এবং ভগিনীর মঙ্গল-কামনা বুকে করিয়া লইয়া পুত্ত উৎফুল্ল-হৃদয়ে স্বদেশরক্ষার্থ সসৈন্যে কৈলবারা ত্যাগ করিলেন।

বয়সে বালক হইলেও পুত্ত সৈন্য-পরিচালনায় ও সাহসিকতায় প্রবীণ। চিতোরে আসিলে তিনি জয়মল্লের সহকারী মনোনীত হইলেন। যুদ্ধে শীঘ্রই আকবরের হস্তে জয়মল্ল নিহত হইলেন। তখন পুত্তই সেনাপতিত্বের কর্ত্তব্য-ভার গ্রহণ করিলেন।

আকবর সৈন্যশ্রেণী দুইভাগে বিভক্ত করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। এক ভাগ তিনি নিজে পরিচালনা করিতেছিলেন। আর এক ভাগ জনৈক প্রবীণ যোদ্ধার নেতৃত্বে পরিচালিত হইতেছিল। এই দ্বিতীয় দলের সহিত পুত্তের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে-

ছিল। পুত্ত যুদ্ধে ব্যস্ত। এই অবসরে তাঁহাকে পার্শ্বদেশ হইতে আক্রমণ করিতে পারিলে সহজেই পরাজিত করা যাইবে মনে করিয়া আকবর নিজের সৈন্যদল লইয়া ধীরে ধীরে পুত্তের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। সহসা সসৈন্য আকবরের গতিরোধ হইল। সম্মুখে বৃক্ষান্তরালে সঙ্কীর্ণ গিরিপথ হইতে অবিরত গুলিবৃষ্টি হইতেছে। মোগল-সৈন্য অগ্রসর হইতে অক্ষম হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল; মুহুর্মুহু গুলিবিদ্ধ হইয়া সৈন্যগণ ধরাতল আশ্রয় করিতে লাগিল। বিস্মিত সম্রাট লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন। বৃক্ষান্তরাল আশ্রয় করিয়া বীর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে জগতের ললামভূতা অশ্বারূঢ়া তিনটি রাজপুত ললনা। একজন বর্ষীয়সী, এবং অন্য দুই জন স্ফুটনোন্মুখ পদ্ম-কোরকের ন্যায় কিশোরী। এই লাবণ্যময়ী কোমলাঙ্গী রমণীত্রয়ের ক্ষিপ্রহস্তনিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে নিজের বিপুল সৈন্যশ্রেণীকে বিপর্য্যস্ত হইতে দেখিয়া সম্রাটের বিস্ময় ক্ষোভে পরিণত হইল।

কর্ম্মদেবী পুত্রকে বিদায় দিয়া নিশ্চিন্ত রহিতে পারিলেন না—প্রাসাদ তাঁহার নিকট কণ্টকশয্যা মনে হইতে লাগিল। তিনি পুত্রের সাহায্যার্থ যুদ্ধে যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। স্বদেশের এরূপ ঘোর বিপদে রণক্ষেত্রই দেশভক্তের উপযুক্ত স্থান। পুত্র পুত্ত বালক মাত্র, তাহাতে নবপরিণীত; প্রণয়িণী পত্নীর প্রেমপূর্ণ মুখকমলের কথা চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্যবিচ্যুত হইতে পারে, এ ভয়ও হয়ত তাঁহার মনে ছিল। তিনি রণসজ্জায় সজ্জিত হইলে বধূ কমলাবতী ও কন্যা কর্ণবতীও মহাহর্ষে ও প্রবল উৎসাহে সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। এই দুই বীরজায়া ও বীর-কন্যাকে সাদরে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহচরী রাজ-পুতানীদের সহিত মহিমময়ী কর্ম্মদেবী অশ্বারোহণে রণ-ক্ষেত্রে গমন করিলেন। সেখানে তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্ম আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইলেন। পরে আকবর পুত্তকে আক্রমণ করিতে যাইতেছেন দেখিয়া তাঁহার গতিরোধ করিয়া তাঁহারা অব্যর্থ-লক্ষ্যে শত্রু-নিপাত করিতে লাগিলেন। আকবর

এই অপূর্ব্ব রণরঙ্গিনীদের যুদ্ধ-কৌশল দেখিয়া বিস্মিত, ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইলেন।

বহুক্ষণ ধরিয়া তুমুল যুদ্ধ চলিল। আকবরের আদেশে বিশাল মোগল-বাহিনী বিপুলবিক্রমে এই মুষ্টিমেয় নারীসৈন্যকে আক্রমণ করিল। কর্ম্ম-দেবীর নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়া এই কয়েকটি নারী অভূতপূর্ব্ব ক্ষমতার পরিচয় দিতে লাগিলেন; তাঁহাদের • ক্ষিপ্রহস্তনিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে বহুতর মোগল ধরাতল আশ্রয় করিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহাদের শ্রেণীও ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল; কিন্তু পূর্ব্ববৎ অভগ্ন রহিল। বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া এক সময়ে বালিকা কর্ণবতী আহত হইয়া ভূপতিত হইলেন। কর্ম্মদেবী দেখিয়াও দেখিলেন না। এ স্নেহ-প্রদর্শনের সময় নহে। যে সাধ করিয়া দেশের জন্য মরণ বরণ করিয়া আসিয়াছিল, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে মরিয়াছে, তাহাতে দুঃখ কি? আরও বহুক্ষণ যুদ্ধ চলিল। অবশেষে বধূ কমলাবতী ও কর্ম্মদেবী স্বয়ং গুলি বিদ্ধ হইয়া পতিত হইলেন।

পুত্ত নিজের স্নেহময়ী আদরিণী ভগিনী, সতীকুল-রাণী প্রিয়তমা পত্নী ও জগতে অতুলনীয়া আরাধ্যা জননীকে একে একে রণক্ষেত্রে পতিত হইতে দেখিলেন। দেখিয়া তিনি দ্বিগুণ বিক্রমে মোগল-সৈন্য মথিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে সম্রাট-সৈন্য পরাজিত করিয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন ভগিনী গতপ্রাণা, জননী ও জায়া মুমূর্ষু। তিনি আসন্নমৃত্যু মাতা ও পত্নীকে নিজের বাহুতে তুলিয়া ধরিলেন। কমলাবতী বড় আকাঙ্ক্ষার বাহু-আশ্রয় পাইয়া স্মিতমুখে প্রিয়তমের মুখের দিকে চাহিলেন; তাঁহার মুখের মিষ্ট মৃদু হাসিটুকু মুখে থাকিতে থাকিতেই প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। কর্ম্মদেবী অতি কষ্টে পুত্রকে বলিলেন' "পুত্ত, এখনও যুদ্ধ শেষ হয় নাই, এখনও চিতোর শত্রু-মুক্ত নহে; এসময় তুমি' এখানে কেন? এ-ত স্নেহে কাতর হইবার স্থান নহে। যাও বৎস, যুদ্ধে শত্রু-ধ্বংস কর যাইয়া। যদি চিতোর রক্ষা করিতে না পার, প্রাণ লইয়া ফিরিও না; দেশের জন্য রণক্ষেত্রে প্রাণ-

বিসর্জ্জন করিও। আমরা স্বর্গে তোমার জন্য অপেক্ষা করিব। বলিতে বলিতে কর্ম্মদেবী চিরতরে নীরব হইলেন।

নিজের সমস্ত হারাইয়া উন্মত্ত পুত্র "হর হর" ভীষণ গর্জ্জনে দিক কম্পিত করিয়া রণক্ষেত্রে ধাবিত হইলেন। ভীমবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া, বহু মোগল সৈন্য নিহত করিয়া অবশেষে তিনিও নিহত হইলেন। পুত্রের ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর দেহ এক চিতায় ও অন্য চিতায় মাতা কর্ম্মদেবীর ও কর্ণবতীর দেহ ভস্মীভূত হইল।

মাতৃজাতির আদর্শ কর্ম্মদেবী দেহত্যাগ করিয়া সমগ্র ভারত ধন্য করিয়া গিয়াছেন। এই একটি মায়ের নামের গৌরবেই সমস্ত ভারত-নারী গৌরবান্বিতা হইতে পারেন। এরূপ মা কি আর ভারতে জন্মিবে না?

দুর্গাবতী

বহু শত বৎসর পূর্ব্বে এক সময়ে মহোবার চন্দেল-বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ প্রবল-পরাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহাদের রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত ছিল। কিন্তু চিরদিন কাহারও সমান যায় না। মুসলমানগণ এদেশে আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলে ক্রমে তাঁহাদের পতন হইতে লাগিল। পাঠান-আধিপত্য যাইয়া যখন দিল্লীতে মোগলের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তখন তাঁহাদেরও ক্ষমতার শেষ হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বংশের প্রাচীন গৌরব যাহা ছিল, তাহাতেই চন্দেল ক্ষত্রিয়গণ বিশেষ বিখ্যাত ও সম্মান-ভাজন ছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহোবার তদানীন্তন ভূপতির এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই এক কন্যার কীর্ত্তিতেই চন্দেল-বংশের নাম অমর হইয়া

রহিয়াছে; নতুবা হয়ত সমস্ত বংশ-গৌরব সঙ্গে তাঁহাদের নাম সাধারণের স্মৃতি হইতে একেবারেই লোপ পাইত। পিতামাতা কন্যার নাম রাখিলেন—দুর্গা। দুর্গা দুর্গাই বটে—মাতা ভগবতীর ন্যায় তাঁহার রূপ, যে কেহ একবার দেখিলে আনন্দে বিস্ময়ে দু'দণ্ড চাহিয়া না থাকিয়া পারিত না। আর তাঁহার অপূর্ব্ব গুণরাশি, অসামান্য তেজস্বিতা আজিও ভারত সুরভিত করিয়া কীর্ত্তিত হইতেছে। রূপে গুণে সাক্ষাৎ ভগবতী দুর্গার বিগ্রহ দুর্গাবতীর উপযুক্ত বর্ণনা করা ভাষায় সম্ভবে না। তাঁহার জন্মে পিতৃ-বংশ অমর হইয়া রহিয়াছে, শ্বশুরকুল মর্য্যাদা পাইয়া চিরতরে ধন্য ও গৌরবান্বিত হইয়াছে, অধিকৃত গড়মণ্ডল তীর্থভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাবতীর রূপের খ্যাতি ও গুণের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। গড়মণ্ডলের তদানীন্তর রাজা দলপৎ শাহ্ সেই কাহিনী শুনিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে একান্ত ইচ্ছুক হইলেন। গড়মণ্ডল তখন সম্পদশালী রাজ্য, রাজা দলপৎশাহ্

বখ্যাত বীর ও তেজস্বী পুরুষ। এরূপ ব্যক্তির সহিত কন্যার বিবাহ দিতে যে কেহই সানন্দে সম্মত হইতেন। কিন্তু চন্দেল-বংশীয়েরা নিজেদের উচ্চ-বংশের গৌরবে গর্ব্বিত ছিলেন। দলপৎশাহ্ বংশ-মর্য্যদায় হীন। সেইজন্য একরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইলেও মহোবারাজ তাহাকে কন্যাদান করিতে সম্মত হইলেন না।

দুর্গাবতী তখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। যেমন তাঁহার অপরূপ লাবণ্য, তেমনি অসামান্য তেজ —যেন রাশিকৃত স্থির বিদ্যুৎখণ্ড। বিদ্যুৎ বিদ্যুৎকেই আকর্ষণ করে। তখন আর্য্যাবর্ত্তের অনেক রাজবংশই মুসলমান-সংশ্রবে কলঙ্কিত হইয়াছিল, মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। দলপৎ নিজের অসাধারণ বীরত্বে ও তেজস্বিতায় গড়মণ্ডলের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সেই তেজস্বিতা দুর্গাবতীর হৃদয় আকর্ষণ করিল; তিনি দলপৎ-শাহ্কেই পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ব্যর্থ প্রাচীন বংশগৌরব অপেক্ষা ব্যক্তি-

গত শৌর্য্যই দুর্গাবতীর নিকট অধিকতর মোহনীয় মনে হইয়াছিল।

দুর্গাবতীর ইচ্ছা অবগত হইয়া দলপৎশাহ্ তাঁহাকে লাভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সৈন্য-সামন্ত লইয়া মহোবা আক্রমণ করিলেন। মহোবারাজ তখন তাহাকে কন্যাদান করিতে বাধ্য হইলেন। যোগ্যে যোগ্যে মিলন হইল। দুর্গাবতী পিতৃরাজ্য ত্যাগ করিয়া স্বামীর সহিত গড়মণ্ডল গমন করিলেন।

গড়মণ্ডল বর্ত্তমান এলাহাবাদ হইতে প্রায় একশত ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে যদু রায় নামক একজন রাজপুত এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। সোহাগপুর, ছত্রিশগর, সম্বলপুর প্রভৃতি জনপদ লইয়া এই রাজ্য সংগঠিত হইয়াছিল। প্রকৃতির অনুকূলতা-বশতঃ উহা ধন-সম্পদে পূর্ণ এবং মনোহর প্রাকৃতিক শোভায় বিভূষিত ছিল। উহার কোথাও জনপূর্ণ পল্লী, কোথাও সুন্দর নদী-তড়াগ অথবা নৃত্যশীল প্রস্রবণ, কোথাও ঘনসন্নিবিষ্ট নয়নানন্দ-দায়ক অরণ্য, কোথাও বা গাম্ভীর্য্যের অবতার

বিরাট-দেহ অটল পর্ব্বত। গড়মণ্ডলের রাজধানী গড়নগর নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ তীরে জব্বলপুর হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। চারিদিক পর্ব্বত-মালায় বেষ্টিত থাকাতে শত্রুপক্ষ সহজে এই নগর আক্রমণ করিতে পারিত না।

দলপৎশাহের সময়ে এইরাজ্য তাঁহার বীরত্বে ও শাসনগুণে বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছিল। এমন রাজ্যের রাণী হইয়া, দলপৎশাহের ন্যায় তেজস্বী বীরকে পতিরূপে পাইয়া দুর্গাবতীর সুখের সীমা ছিল না। অন্যদিকে এই সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর আগমনে গড়-মণ্ডলের অনুপম শোভা দ্বিগুণিত হইল। বিবাহের পর এইরূপে দুর্গাবতী শোভায়, সৌন্দর্য্যে, সুখে প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় বিকশিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ভাগ্যদেবতার সে সুখ সহ্য হইল না। বিবাহের চারি বৎসর পরে দলপৎশাহ্ বীরনারায়ণ নামক একটি পুত্র-সন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন।

রাণী দুর্গাবতীর সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

কিন্তু তিনি শোকে মুহ্যমান হইলেন না। তিনি তাঁহার তিন বৎসর বয়স্ক শিশু পুত্রের প্রতিনিধি-স্বরূপ রাজ্যের গুরুভার নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন। আধর নামে তাঁহার একজন অতি বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। এই মন্ত্রিপ্রবরের পরামর্শে ও সহায়তায় তিনি রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। রাজ্যের মঙ্গল-কামনায় তিনি স্বামী-শোক কিয়দংশে ভুলিয়া থাকিতেন। তাঁহার শাসনগুণে গড়মণ্ডলের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি রাজ্যের সর্ব্বত্র জলাশয়-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানা লোক-হিতকর কার্য্য করিয়া প্রজা-সাধারণের হৃদয়-মন আকর্ষণ করিলেন। তাহারা তাহাকে আপন আপন মাতার ন্যায় ভাল-বাসিত, আরাধ্য দেবীর ন্যায় ভক্তি করিত, পূজা করিত। চারিদিকে তাহার রাজ্য-শাসন-খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল; গড়মণ্ডল ও গড়মণ্ডলের দেবীতুল্যা রাণীর কথা ভারতে বিখ্যাত হইল। আজিও সে প্রদেশ তাহার অক্ষয় কীর্ত্তিতে পরিপূর্ণ; এখনও লোকে তাহার নাম ভক্তির সহিত স্মরণ করে।

দুর্গাবতী এইরূপে পনর বৎসর মহাগৌরবে রাজত্ব করিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাহার জনকয়েক শক্তিশালী শত্রুর সহিত কয়েকবার ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং প্রতিবারেই তিনি জয়লাভ করেন। যুদ্ধে তাহার অধীনে ২০,০০০ সুদক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য ও সহস্র হস্তী পরিচালিত হইত। বন্দুক ও শরচালনায় তাহার লক্ষ্য কখন ব্যর্থ হইত না। শিকারে তাহার ক্লান্তি ছিল না। ব্যাঘ্রের উৎপাতের কথা শুনিলে তিনি তাহাকে বধ না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। তাহার অসাধারণ বীরত্ব-খ্যাতি তাহার শাসন-খ্যাতিরই অনুরূপ ছিল।

পনর বৎসর পরে ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট আকবরের আদেশে তাঁহার সেনাপতি আসফ খাঁ গড়মণ্ডল আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। মন্ত্রিবর অধর দিল্লীতে যাইয়া এই আক্রমণ নিবারণের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সফলকাম হইতে পারিলেন না। তিনি ফিরিতে না ফিরিতেই আসফ খাঁ ছয় হাজার অশ্বারোহী, বার হাজার পদাতিক ও বহুতর কামান

লইয়া গড়মণ্ডল আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধের ফলে গড়মণ্ডল প্রদেশ আকবরের সম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। আসফ খাঁ সফলকাম হইলেও, তাঁহাকে বীরাঙ্গনা দুর্গাবতীর হস্তে কম লাঞ্ছনা পাইতে হয় নাই। রাণী দুর্গাবতী পরাজিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু যতদিন স্বাধীনতার মূল্য থাকিবে, ততদিন তাহার নাম সগৌরবে কীর্ত্তিত হইবে, তাহার এই যুদ্ধ ও আত্মত্যাগের কাহিনী দেশভক্তগণের হৃদয়ে সুবর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

মোগল-সাম্রাজ্যের সহিত তুলনায় গড়মণ্ডল নিতান্ত ক্ষুদ্র রাজ্য। তাহার পর মোগলের বিজয়-বার্ত্তা তখন সমগ্র ভারতে বিঘোষিত হইয়াছে। তাই যখন আসফ খাঁর আক্রমণের কথা প্রচারিত হইল, তখন প্রজাসাধারণ ও সৈন্যগণ ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িল। অধিকাংশ সৈন্য রাণীকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। অবশিষ্ট যাহারা রহিল, তাহারা রাণীর উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যে উৎসাহিত হইয়া স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়া যুদ্ধ করিতে

প্রস্তুত হইল। তাহার অষ্টাদশ বর্ষীয় পুত্র বীর-নারায়ণও যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইলেন। সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত রহিলেন না। তিনি স্বয়ং যোদ্ধৃবেশে সজ্জিত হইয়া, মাথায় মুকুট এবং এক হস্তে শাণিত শূল ও অপর হস্তে ধনুর্ব্বাণ লইয়া সাক্ষাৎ ভগবতী দুর্গার ন্যায় হস্তীতে আরোহণ করিলেন। এই যুদ্ধের তিনিই অধিনায়িকা হইলেন। অসুর-দলনে দেবী দুর্গা অপেক্ষা কে যোগ্যতর ?

তিনি যখন সৈন্য-সামন্ত লইয়া সিংহলগড়ে যুদ্ধার্থ শত্রুর সম্মুখীন হইলেন, তখন তাঁহার এই ভৈরবী দেবী মূর্ত্তি দেখিয়া মুসলমান সৈন্য বিস্মিত ও ভীত হইল। দুইবার তিনি আসফ খাঁকে আক্রমণ করিলেন এবং দুইবারই তাহার জয়লাভ হইল। বহু শত্রু-সৈন্য বিনষ্ট হইল। অবশেষে মোগলেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তিনিও নিজের সৈন্য একত্র করিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, তিনি শত্রুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছেন। যে মোগল বীরপুরুষেরা প্রায় সমগ্র

আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়াছিলেন, আজ তাহারা এই বীর রমণীর পরাক্রমে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। তাহারা তখন গড়মণ্ডল হইতে ১২•মাইল পূর্ব্বে একটী গিরিসঙ্কটের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তুর্গাবতী তখন সৈন্যগণকে বিশ্রাম করিবার জন্য আদেশ দিলেন।

তুর্গাবতীর ইচ্ছা ছিল বিশ্রামান্তে সেই রাত্রেই পুনরায় আসফ খাঁকে আক্রমণ করিবেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ ধরিয়া বসিল তাহাদিগকে সমস্ত রাত্রি বিশ্রাম করিতে দিতে হইবে। রাণী ক্ষুণ্ণমনে তাহাদের অনুমতি দিলেন। এই বিশ্রামই তাঁহার কাল হইল। আসফ খাঁ তুইবার পরাজিত হইয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তুর্গাবতীর সৈন্যগণ বিশ্রাম করিতেছে জানিয়া তিনি সানন্দে রাত্রির মধ্যে নিজের সৈন্যবল একত্র করিয়া প্রভাত হইতে না হইতেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তখনও আসফ খাঁর কামান আসিয়া পৌঁছে নাই। প্রথম আক্রমণে তিনি তুর্গাবতীর নিকট পরাজিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন।

পরদিন প্রভাতে তাহার কামানশ্রেণী পৌঁছিলে বিপুল-বিক্রমে পুনরায় দুর্গাবতীকে আক্রমণ করিলেন। দুর্গাবতী স্বয়ং হস্তি-পৃষ্ঠে থাকিয়া গিরিসঙ্কট রক্ষা করিতে লাগিলেন। একে তিনি মোগলের তুলনায় সামান্য সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাহাতে অসুবিধাকর স্থানে মোগলের ভীষণ কামানের গোলা-বর্ষণে তাঁহার সৈন্যশ্রেণী দ্রুত ক্ষীণ হইতে লাগিল। তাঁহার সৈন্যগণ অসীম-সাহসে প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেও অবিরত গোলাবর্ষণে কাতর হইয়া পড়িল। তিনি কিন্তু অচল অটল।

তাঁহার পুত্র কুমার বীরনারায়ণ মায়ের উপযুক্ত বীর-পুত্র। তিনি অসাধারণ বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। অবশেষে বহুসংখ্যক সৈন্যের একত্র আক্রমণে আহত হইয়া পতনোন্মুখ হইলেন। মাতার আদেশে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হইল। তাঁহাকে শীঘ্রই চৌরগড় দুর্গে প্রেরণ করা হইয়াছিল। পরে আসফ খাঁ সেই দুর্গ আক্রমণ করিলে তিনি যুদ্ধে নিহত হন এবং দুর্গস্থ রমণীগণ গৃহে অগ্নিসংযোগ

করিয়া জহরব্রত পালন করেন। পুত্রকে আহত ও হতচেতন হইয়া পড়িতে দেখিয়াও দুর্গাবতী কিন্তু কাতর হন নাই—তিনি সমানভাবেই যুদ্ধ করিতে থাকেন।

পূর্ব্বরাত্রে তিনি যখন সসৈন্যে এই গিরিসঙ্কটে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাদের পশ্চাতে একটী শুষ্কপ্রায় পার্ব্বত্য নদী ছিল। প্রভাতে যুদ্ধের সময় ঐ নদী জলপূর্ণ হইয়া বৃহৎ স্রোতস্বতীর আকার ধারণ করে। এইজন্য তিনি সৈন্য লইয়া কামানের গোলাবর্ষণ হইতে দূরে যাইতে পারেন নাই। একে একে অধিকাংশ সৈন্য গোলার আঘাতে পতিত হইল। তিনি তখন মাত্র তিন শত সৈন্য লইয়া সহস্র সহস্র মোগল-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে একটি তীর আসিয়া তাঁহার চক্ষে বিদ্ধ হইল। তিনি শরটি তুলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়া বিফল হইলেন। ইহাতেও কাতর না হইয়া তিনি অটলভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে আর একটি তীর আসিয়া

তাঁহার গ্রীবাদেশে বিদ্ধ হইল। তখন জয়ের আশা বিন্দুমাত্রও নাই, তবুও তিনি ভীত হইলেন না। তাঁহার হস্তিচালক পশ্চাতের নদী পার হইয়া যাইতে বার বার অনুমতি চাহিল। কিন্তু তিনি সম্মত হইলেন না। বীর্য্যবতী দুর্গাবতী স্বদেশকে শত্রু-করতলগত দেখিয়া পরাজয়ের কলঙ্ক বহন করিয়া পলায়ন করা অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে দেহ-ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন।

এই সময়ে ক্ষতস্থান হইতে অবিরত রক্ত-নিঃসরণে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। জীবিতা-বস্থায় শত্রুর হস্তে পড়িবার সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি হস্তিচালকের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ তরবারি গ্রহণ করিয়া নিজ বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিলেন। মুহূর্ত্তে সব শেষ হইল—ভারতোজ্জ্বল-কারিণী তড়িৎ নিভিয়া গেল।

পৃথ্বীরাজ-পত্নী

নারী দুর্ব্বলা, নারী ভয়-কাতরা। তাই আজ তাঁহার উপর কত রকমের কত অত্যাচার যে হইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কত নির্য্যাতন, কত সতীত্বনাশের করুণ কাহিনী যে আমরা প্রতিনিয়ত শ্রবণ করিতেছি তাহার ইয়ত্তা নাই। হিন্দু-নারীর নিকট তাঁহার সতীত্বই শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সতীত্ববলেই তিনি ইহলোকে গৌরব এবং পরলোকে স্বর্গসুখ লাভ করিবার আশা করেন। সেই অমূল্য সম্পদ সতীত্ব তাঁহার দুর্ব্বলতার জন্য দুর্ব্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইতেছে, এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। হিন্দু-নারী যদি দুর্ব্বল না হইতেন, সামান্য ভয়ে ভীত না হইতেন, নিজের সতীত্ব রক্ষা করিতে অস্ত্রধারণে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে আজ আমাদিগকে এ সমস্ত একান্ত দুঃখের ও লজ্জার কাহিনী শুনিতে হইত না। বাঙ্গালী পুরুষ এখন নারীর অধম।

বাঙ্গালী সতীকে এখন নিজের সতীত্ব নিজে রক্ষা করিতে হইবে। পুরুষ সমর্থ হইলেও সর্ব্বত্র তাহার সাহায্য পাওয়া সম্ভব না-ও হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে নিজের ইহ-পরলোকের এই শ্রেষ্ঠ সম্পদ রক্ষা করিতে প্রস্তুত না থাকিলে আর চলিবে না। প্রবলতম শত্রুর সমক্ষেও, নিঃসহায় একক হইয়াও, নিজের সতীত্ব রক্ষা করা অসম্ভব নহে, বহু বৎসর পূর্ব্বে ইহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া একজন রাজপুত-মহিলা আজিও স্মরনীয়া ও বরনীয়া হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারই সেই অপূর্ব্ব কথা এখানে বলিব।

এই মহীয়সী মহিলার নাম আমরা ইতিহাসে পাই না। তাঁহার এই মাত্র পরিচয় আমারা জানি যে, তিনি মিবারের শক্তাবৎ বংশের প্রতিষ্ঠাতা, দেশভক্তগণেয় চিরপূজ্য আদর্শ রাণা প্রতাপসিংহের ভ্রাতা শক্তসিংহের কন্যা এবং বিকানীরের তদানীন্তন রাজা রায়সিংহের ভ্রাতা তেজস্বী বীর পৃথ্বীরাজের পত্নী।

পৃথ্বীরাজ এ সময়ে তাঁহার ভ্রাতার প্রতিভূ-স্বরূপ দিল্লীশ্বর আকবরের সভায় প্রেরিত হইয়া দিল্লীতে বাস করিতেছিলেন। সেখানে তাঁহার স্বাধীনতা বিশেষ ছিল না। দায়ে পড়িয়া এই অবস্থায় বাস করিলেও পৃথ্বীরাজের হৃদয় তেজস্বিতায় পূর্ণ ছিল। এক সময়ে নিতান্ত দুঃখে অভিভূত হইয়া দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে বীর প্রতাপসিংহ আকবরের নিকট আত্মসমর্পণ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। তাহা জানিতে পারিয়া পৃথ্বীরাজ ওজস্বিনী ভাষায় এক পত্র লিখিয়া তাঁহাকে এই হীনতা-স্বীকার হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন। পৃথ্বীরাজের পত্নী তাঁহার উপযুক্ত সহ-ধর্ম্মিণী ছিলেন।

মোগল-সম্রাট আকবরের বহু গুণের মধ্যে পররাজ্য ও পরস্ত্রী-লোলুপতা এই দুইটি অতি মহৎ দোষ ছিল। পররাজ্য-লোলুপ হইয়াই তিনি চিতোর-ধ্বংস করিয়াছিলেন, মহীয়সী দুর্গাবতীর গড়মণ্ডল রাজ্যের বিলোপ-সাধন করিয়াছিলেন এবং আরও অনেক রাজ্য ও রাজার সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন

আর পরস্ত্রী-লোলুপ হইয়া অন্যান্য উপায়ের মধ্যে 'খোষরোজে'র বাজারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

মাসিক প্রধান উৎসব হইতে নবম দিবসে এই বাজার বসিত। এইজন্য ইহা 'নওরোজা' নামে প্রসিদ্ধ। আকবর আদর করিয়া ইহার নাম রাখিয়াছিলেন 'খোষরোজ' বা আনন্দের দিন। এই বাজার রমণীর বাজার। দিল্লীর সুন্দরীমণ্ডলী এই বাজারে সমবেত হইতেন—কেহ কিনিতেন, কেহ বেচিতেন। আমীর ওমরাহ্ ও অন্যান্য সভাসদ্গণকে তাহাদের পরিবারস্থ রমণীগণকে এখানে পাঠাইতেই হইত—নতুবা সম্রাট অসন্তুষ্ট হইতেন। এ বাজারের অধিষ্ঠাত্রী হইতেন সম্রাটের প্রধানা মহিষী। পুরুষের এ বাজারে প্রবেশের অধিকার ছিল না। কিন্তু সম্রাট নিজে নারীবেশে গুপ্তভাবে এখানে উপস্থিত থাকিয়া রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীগণের রূপ-সুধা নয়নদ্বারা পান করিতেন এবং কাহারও প্রতি মন বিশেষ আকৃষ্ট হইলে অতি সঙ্গোপনে ছলে-বলে-কৌশলে তাঁহার সর্ব্বনাশ-সাধন করিতেন। তবু

জানিয়া হউক না জানিয়া হউক, মহাপরাক্রান্ত সম্রাটকে সন্তুষ্ট করিতে প্রত্যেক পরিবারের রমণী-গণকে এখানে সমবেত হইতে হইত। এক সময়ে পৃথ্বীরাজের ভ্রাতা বিকানীর-রাজ রায়সিংহের পত্নীকেও এঁই বাজারে কামুক সম্রাটের নিকট নিজের সতীত্ব-রত্ন বিকাইতে হইয়াছিল।

সেদিন খোষরোজ। সম্রাটের বিশাল অন্তঃপুরে বাজার বসিয়াছে। দিল্লীর সুন্দরীবর্গ বিচিত্র বেশে সজ্জিত হইয়া বাজারে অপূর্ব্ব-রূপের হাট বসাইয়া-ছেন। দেশের সমস্ত সুন্দর শিল্প-দ্রব্য দোকানে দোকানে সজ্জিত রহিয়াছে। মোগলানী ও রাজপুতানীগণের জগদ্বিখ্যাত কমনীয় রূপে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়াছে। রমণীগণই এখানে ক্রেতা রমণীগণই বিক্রেতা—

রমণীতে বেচে, রমণীতে কেনে,
লেগেছে রমণী-রূপের হাট।'

এই রূপের হাটে সম্রাট আকবর প্রধান ক্রেতা—তিনি গুপ্তবেশে ভ্রমণ করিতেছেন। কোনও

লাবণ্যবতী যুবতীকে অতৃপ্তচক্ষে চাহিয়া দেখিতেছেন, কাঁহারও সহিত বা হাসিয়া হাসিয়া আলাপ করিতেছেন, কাঁহারও বা দোকানে যাইয়া শিল্পদ্রব্যের দাম জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং দ্বিগুণ মূল্য দিয়া সেই দ্রব্যের সহিত তাঁহার ভুবন-ভুলান হাসি ক্রয় করিতেছেন। হঠাৎ তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। সম্মুখে দেখিলেন এক নবীনা যুবতী—যাঁহার রূপের এক কণা পাইলে যে কেহ সুন্দরী বলিয়া গণ্যা হইতে পারেন। যুবতী তাঁহার চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—সম্রাট-পতঙ্গ তাঁহাতে প্রবলবেগে আকৃষ্ট হইলেন।

সুন্দরী বাজার দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মুগ্ধ সম্রাটও গুপ্তভাবে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। যুবতী গৃহগমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই বাজার হইতে বাহির হইবার পথ বড় জটিল। নানাদিক দিয়া নানাকক্ষ দিয়া তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সম্রাটের কোনও গুপ্তচর তাঁহাকে এই পথ

দেখাইয়া দিয়াছিল। ক্রমে তিনি একটি অতি সুসজ্জিত কক্ষে উপস্থিত হইলেন। হঠাৎ তাঁহার গতিরোধ হইল—সম্মুখে ভারতের প্রবলতম সম্রাট দিল্লীশ্বর আকবর।

গমন-পথ নিরুদ্ধ দেখিয়া তিনি থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন। এই অবসরে জ্ঞান শূন্য সম্রাট আকুল প্রেম নিবেদন করিলেন। এই অপবিত্র প্রস্তাবে সতী মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত রহিলেন; ক্রোধে তাঁহার অন্তরাত্মা জ্বলিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত পরে তিনি অঙ্গাবরণের অভ্যন্তর হইতে এক সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা নিষ্কাশিত করিয়া সম্রাটের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া ধরিয়া বলিলেন, "পাপিষ্ঠ, যদি নিজের মঙ্গল চাহ, যদি প্রাণের মায়া থাকে, তাহা হইলে আমার গমন-পথ ছাড়িয়া দাঁড়াও। নতুবা তুমি দিল্লীশ্বরই হও আর যে-ই হও এই শাণিত ছুরিকা তোমার বক্ষ-শোণিত পান করিয়া রাজপুতানীর সতীত্ব রক্ষা করিবে।" আকবর শাহ্ সুন্দরীর সেই জ্যোতির্ম্ময়ী ভৈরবী মূর্ত্তি দেখিয়া কয়েক পদ

হঠিয়া গেলেন—ভয় তাঁহার লালসার স্থান অধিকার করিল। যে রূপের আলোকে তিনি পতঙ্গের মত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার অলোক-সামান্য তেজে ভস্মীভূত হইবার ভয়ে তিনি পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন। এখন তিনি হিন্দু-নারীর সতীত্বের তেজের যথার্থ পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ ও শ্রদ্ধান্বিত হইলেন এবং আর কখনও কোনও রাজ-পুতানীর সতীত্ব-নাশের চেষ্টা করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

এই বীরাঙ্গনাই পৃথ্বীরাজের পত্নী। নিজের সতীত্ব রক্ষা করিবার সামর্থ্য ছিল বলিয়াই তিনি এই পাপের বাজারে পদার্পণ করিতে সাহস করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়াও গিয়াছিলেন। সম্রাট আকবরের ন্যায় সর্ব্বরকমে মহা-পরাক্রমশালী ব্যক্তির নিকট হইতে অনায়াসে নিজের সতীত্ব রক্ষা করিয়া আজ তিনি অমর ও চিরযুগের সতীগণের আদর্শ হইয়া রহিয়াছেন।

যশোবন্ত-মহিষী

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে যখন সম্রাট সাজাহান দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন মাড়োয়ারে রাঠোর বংশীয় যশোবন্ত সিংহ রাজা। তিনি অদ্বিতীয় বীর ও অসম-সাহসী যোদ্ধা। যোধপুর তাঁহার রাজধানী। যোধপুরাধিপতি যশোবন্ত সিংহের নামে শত্রুগণ ভয়ে কম্পিত হইত। কিন্তু প্রবল-প্রতাপ মোগলের অধীনতা তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল। মাড়োয়ার ক্ষুদ্র রাজ্য—তাহার মত কত ক্ষুদ্র রাজ্য মোগল-সম্রাটকে কর-দান করিত। ইহাতে তাঁহার বীর-খ্যাতির লাঘব হয় নাই। তিনি সম্রাট সাজাহানের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন।

যশোবন্ত সিংহের প্রধানা মহিষী ছিলেন রাজস্থান গৌরব মিবারের রাজবংশসম্ভূত। যে বংশের রমণীগণের বীরত্বের, মহত্ত্বের এবং ত্যাগের অপূর্ব্ব

কাহিনী সকল আজিও ভারত আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে, তিনি তাহার উপযুক্ত কন্যা ছিলেন। তাঁহাতে সতীত্বের, তেজস্বিতার, দেশপ্রীতির ও প্রিয়ানুরাগের অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছিল। এই মহীয়সী মহিলার সমগ্র জীবন কথা আমরা জানি না। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে একটিমাত্র কাহিনী যাহা ইতিহাসে গৌরবের সহিত উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই তাঁহাকে চিরযুগে অমর করিয়া রাখিবে।

বৃদ্ধ বয়সে সম্রাট সাজাহান অসুস্থ হইয়া পড়েন। সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র তাঁহার চারি পুত্র দারা, সুজা, ঔরংজেব ও মুরাদের মধ্যে রাজ্যাধিকার লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। সে এক অচিন্তনীয় ব্যাপার। সামান্য রাজ্যলোভে ভ্রাতা ভ্রাতার রক্তশোণিত পান করিতে উদ্যত! জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা সর্ব্বগুণান্বিত এবং পিতার প্রিয়পাত্র ছিলেন। এ সময়ে তিনি পিতার নিকট থাকিয়া তাঁহাকে রাজ্য-পরিচালনায় সাহায্য করিতেছিলেন। সিংহাসন তাঁহারই পাইবার কথা। অন্য তিন ভ্রাতা বিভিন্ন

প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত ছিলেন। এই তিনজন তিন দিক হইতে সৈন্য-সামন্ত লইয়া রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভ্রাতা ভ্রাতার কণ্ঠ ছিঁড়িয়া নিজের ভোগের সুবিধা করিবে, এই হীন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে ভারত নরশোণিতে প্লাবিত হইবার উপক্রম হইল।

তিন ভ্রাতার মধ্যে ঔরংজেব সমরদক্ষতায় ও কূটনীতিতে দারার ভয়ের কারণ ছিলেন এবং এ ক্ষেত্রে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে বাধা দিতেই দারাকে অধিক মনোযোগী হইতে হইল। রাজধানীস্থিত সমস্ত সম্রাট-সৈন্য তাঁহার সাহায্যে নিযুক্ত। সেনাপতি যশোবন্ত সিংহও সদলে তাঁহার সাহায্যার্থ ঔরংজেবের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।

যশোবন্ত সিংহ মহাবীর, কিন্তু কূটনীতি-দক্ষ নহেন। ইহার উপর তিনি গর্ব্বিত এবং নিজের ক্ষমতায় অত্যধিক আস্থাবান ছিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন অনায়াসেই ঔরংজেবকে পরাজিত

করিবেন। বাহুবল যদি উভয়পক্ষের একমাত্র সম্বল হইত, তাহা হইলে যশোবন্তকে নিরাশও হইতে হইত না। কিন্তু কূটনীতি ছিল ঔরংজেবের প্রধান অস্ত্র। ঐ নীতির বলে তিনি সরলচিত্ত ভ্রাতা মুরাদকে বশীভূত করিয়া উভয়ের সম্মিলিত সৈন্য লইয়া যশোবন্তের বিরুদ্ধে উপস্থিত হইলেন। যশোবন্ত পরাজিত হইলেন। কিন্তু মহাবীর যশোবন্ত সম্মিলিত শত্রুসৈন্যশ্রেণী ভেদ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিলেন।

যশোবন্ত যুদ্ধে গমন করিলে স্বামিগতপ্রাণা মহিষী স্বামীর চিন্তাতেই দিন কাটাইতেছিলেন। স্বামীর সহিত বিচ্ছেদ ঘটিলে কাতরা হন না এমন কে সতী রমণী আছেন? মহিষীও কাতরা হইয়াছিলেন। কবে তাঁহার প্রাণাধিক-প্রিয় স্বামী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিবেন তাহারই জন্য তিনি দিন গণিতেছিলেন। বিরহের এই কাতরতার মধ্যে স্বামীর বীরত্বের খ্যাতির কথা, তাঁহার বিজয়-গৌরবের কথা তাঁহাকে যাহা কিছু সান্ত্বনা দিতেছিল।

স্বামীর চিন্তায়, তাঁহার বিজয়-কথার আলাপে তিনি সর্ব্বদা মগ্ন থাকিতেন। সহচরীরা সেই কথাই বলিত, সেই গানই গাহিত।

সে দিন মহিষীকে ঘিরিয়া সহচরীরা সঙ্গীতালাপ করিতেছিল। তাহারা গাহিতেছিল—"আমাদের মহারাজ মহাবীর, যুদ্ধে তিনি চিরবিজয়ী। তিনি ন্যায়ের পক্ষ লইয়া যুদ্ধে গিয়াছেন। ন্যায় জয়ী হইবে, তিনি বিজয়-মুকুট পরিয়া ফিরিয়া আসিবেন। সে বিজয়ের গর্ব্বে মাড়োয়ার আনন্দে হাসিবে, আমাদের গরবিনী রাণীর সুখের সীমা থাকিবে না। স্বামীর গর্ব্বে বীর-জায়ার শির উচ্চ হইবে, মহিমায় দেশ ভরিবে। আমাদের মহারাজ মহাবীর, যুদ্ধে তিনি চিরবিজয়ী।"

গানের সঙ্গে স্বামীর গর্ব্বে রাণীর হৃদয় দুলিতেছিল। এমন সময় সংবাদ আসিল—মহারাজ ফিরিয়া আসিতেছেন। রাণীর হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বসন সংযত করিবার বিলম্বটুকুও যেন তাঁহার সহিতেছিল না। প্রাণের প্রিয়তম আরাধ্য দেবতাকে

অভ্যর্থনা করিবার জন্যই যেন তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু সে উল্লাস টিকিল না। যে মহারাজের আগমন-সংবাদ আনিয়াছিল সে-ই জানাইল, "মহারাজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।" রাণী স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন—কথাটার অর্থ যেন তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল না। ক্রমে তাঁহার সুন্দর মুখশ্রী কালিমালিপ্ত হইল, আস্তে আস্তে তিনি হত-চৈতন্যের ন্যায় বসিয়া পড়িলেন।

মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া তিনি কঠোর আজ্ঞা দিলেন, "নগর-দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। আমার বিনানুমতিতে যেন একটী প্রাণীও নগরে প্রবেশ করিতে না পারে। স্বামীর অবর্ত্তমানে আমিই রাজ্যেশ্বরী। আমার স্বামী মহাবীর, মহাতেজস্বী, বিজয়-মুকুট পরিয়া তিনি ফিরিবেন, অন্যথা সমরক্ষেত্রে শত্রুশবে বেষ্টিত হইয়া মহাশয়ন করিবেন! পরাজিত হইয়া তিনি ফিরিতে পারেন না। জয়ের আনন্দের আভায় তাঁহার আগমন ঘোষিত হইবে। তাঁহার

অবর্ত্তমানে অন্য কাহাকেও নগরে প্রবেশ করিতে দেওয়া সঙ্গত নয়। পরাজয়ের কলঙ্ক-কালিমালিপ্ত হইয়া যে কাপুরুষ ফিরিতেছে, সে কখনই আমার স্বামী হইতে পারে না—নিশ্চয়ই সে কোনও প্রতারক। তাহাকে যেন কোনও ক্রমে নগরে প্রবেশ করিতে দেওয়া না হয়।”

আদেশ মাত্র নগর-রক্ষকের নিকট সংবাদ লইয়া লোক ছুটিল। নগর-রক্ষক রাণীর আদেশ শিরো-ধার্য্য করিয়া লইলেন। যশোবন্ত যখন নগরদ্বারে পৌঁছিলেন, তখন তাহা বন্ধ। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া তিনি ও সৈন্যগণ বিশ্রাম করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রহরী কিছুতেই দ্বার খুলিল না, রাণীর আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহস বা ইচ্ছা করিল না। যশোবন্ত শুনিলেন তাঁহার প্রেমময়ী পত্নী পরাজয়ের কলঙ্কে কলঙ্কিত তাঁহাকে নগর প্রবেশ করিতে দিতে নিষেধ করিয়াছেন।

যে প্রাণাধিক দয়িতকে দেখিবার জন্য তিনি কাতরা হইয়াছিলেন, তাঁহাকেই কর্ত্তব্যচ্যুত হইতে

দেখিয়া এইরূপ কঠোরভাবে নগর-প্রবেশ বন্ধ করিবার আদেশ দিয়া যে তেজস্বিতা তিনি দেখাইয়াছিলেন তাহার জন্যই এই মহীয়সী রাণীর গৌরব আজিও কীর্ত্তিত হইতেছে। ইহাকেই বলে—কুসুম হইতেও কোমল, অথচ বজ্র হইতেও কঠোর।

ইহার পর যখন ভ্রাতৃরক্তে দেশ প্লাবিত করিয়া ঔরংজেব দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার কূট-নীতিতে অভিভূত হইয়া যশোবন্তকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়। ঔরংজেব যশোবন্তকে বিশেষ ভয় করিতেন এবং কৌশলে তাঁহাকে বধ করিবার চেষ্টাই সর্ব্বদা করিতেন। তিনি নানাস্থানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং অবশেষে কাবুলে বিদ্রোহ দমন করিতে প্রেরিত হন। এই সময়ে দিল্লীতে ঔরংজেবের কৌশলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রাণত্যাগ করেন এবং অপর দুই পুত্র কাবুলে প্রাণত্যাগ করেন। অল্পদিন পরে যশোবন্ত নিজেও প্রাণত্যাগ করিলেন।

পতিব্রতা মহিষী স্বামীর চিতায় আরোহণ করিয়া

প্রাণত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তখন সাত মাস গর্ভবতী—মাড়োয়ারের রাজবংশের একমাত্র অবশিষ্ট বংশধর তাঁহার গর্ভে। সেইজন্য অনুচর রাজপুতেরা কিছুতেই তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইতে দিল না।

পরে শিশুসন্তানকে লইয়া যখন তিনি স্বরাজ্যে ফিরিতেছিলেন, তখন প্রতিহিংসাপরায়ণ ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে সপুত্র দিল্লীতে বন্দী করেন। রাঠোর-বীরেরাও তাঁহাদের রাজপুত্রকে রক্ষা করিতে কৃত-সঙ্কল্প হন। তখন দেড়শত হিন্দুবীর পাঁচহাজার মুসলমানের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাণী ও রাজপুত্রকে উদ্ধার করিয়া লইয়া রাজস্থানে পলায়ন করেন। সেখানে মিবারপতি রাজসিংহ তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিলেন। রাজসিংহ রাণীর পিতৃবংশের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ বীর—রাজস্থানের উজ্জ্বল সূর্য্য।

রাজসিংহ আত্মীয়-সম্বন্ধে এই মাতাপুত্রের যথার্থ অভিভাবক ছিলেন। কিন্তু তবুও তেজস্বিনী যশোবন্ত-মহিষী তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে

ইচ্ছা করিলেন না। তিনি শিশুকে রাখিয়া স্বরাজ্যে গমন করিলেন। সেখানে তিনি তাঁহার প্রজাবর্গকে উদ্বোধিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং শীঘ্রই তাহার ফল ফলিল। অল্পদিনেই সমস্ত মাড়োয়ার উদ্বুদ্ধ হইয়া মোগল-সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিল। রাণীর নিজের দৃষ্টান্ত ও তাঁহার উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যাবলি প্রত্যেক রাঠোরের প্রাণে অত্যাচারী মুসলমানের বিরুদ্ধে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিল।

লক্ষ্মীবাই

সত্তর পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বে একদিন কাণপুরের নিকট বিঠুরে একটি বিবাহ হইতেছিল। বিবাহের কন্যাটি বড় অসাধারণ রকমের; যেমন তাঁহার অপরূপ রূপ, তেমনি নির্ভীকতা। নিতান্ত বালিকা হইলেও তিনি গ্রন্থিবন্ধনের সময় পুরোহিতকে বলিয়া ফেলিলেন—"গ্রন্থি শক্ত করিয়া বাঁধিবেন, যেন খুলিয়া না যায়।" সকলে অবাক।

এই অদ্ভুত মেয়েটির নাম মনু—মনুবাই। রাজ্যচ্যুত মহারাষ্ট্রপতি পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের সহচর মোরোপন্ত তাম্বে নামক একজন ব্রাহ্মণের কন্যা তিনি। বিবাহ হইতেছিল ঝান্‌সীর রাজা গঙ্গাধর রাওয়ের সহিত। গঙ্গাধর রাও কন্যার তুলনায় কিছু বয়স্ক লোক; এটি তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ।

এই মেয়ে যখন স্বামিগৃহে আসিলেন, তখন ঝান্‌সীবাসী তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। সকলে বলিল 'এ যে স্বয়ং লক্ষ্মী' এবং লক্ষ্মী বলিয়াই তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল। সেই হইতে মনুবাই হইলেন লক্ষ্মীবাই। এখন মনুবাই নাম বড় কাহারও স্মরণ নাই ; কিন্তু যতদিন ভারতবর্ষ থাকিবে, যতদিন ইহার ইতিহাস থাকিবে, ততদিন ঝান্‌সীর রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের নাম লোপ পাইবে না।

ভরেতবর্ষের মধ্যস্থলে বুন্দেলখণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশে ঝান্‌সী একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহার প্রাকৃতিক শোভা অতি মনোরম। পূর্ব্বে ইহা মহারাষ্ট্র-গৌরব পেশোয়ার আশ্রিত ছিল। ইহার রাজারাও ঐ মহারাষ্ট্রবংশীয় ছিলেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন উহা ইংরাজের অধীন। ইংরাজ এ সময়ে ছলে-বলে-কৌশলে বহু রাজ্য অধিকার করিয়া প্রবল পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছেন। সমগ্র মহারাষ্ট্রই এখন তাহাদের অধীন হইয়াছে। অন্যান্য মহারাষ্ট্র রাজ্যের ন্যায় ঝান্‌সীও ইংরাজের সহিত সন্ধিসূত্রে

আবদ্ধ হইয়া উহার করদ রাজ্যে পরিণত হইয়াছে।

বিবাহের ৭।৮ বৎসর পরে লক্ষ্মীবাই একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করেন। পরিণতবয়স্ক গঙ্গাধর রাওয়ের ইহাই প্রথম সন্তান। তিন মাস যাইতে না যাইতেই এই পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাতে প্রাণে যে দারুণ বেদনা পান, তাহাতে গঙ্গাধরের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। অল্প দিনেই নিজের মৃত্যুকাল সন্নিকট বুঝিয়া তিনি নিজের কোনও নিকট-আত্মীয়ের পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করেন। এই পুত্রের নাম হয় দামোদর রাও।

এ-সময়ে লর্ড ডাল্‌হৌসী ছিলেন ভারত-সাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্তা—বড়লাট। ডালহৌসীর উদ্দেশ্য ছিল ছলে-বলে-কৌশলে সমস্ত ভারতবর্ষ ইংরাজের অধীনে আনয়ন করা। এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি সন্ধিভঙ্গ করিয়া একদিকে যেমন কয়েকটি রাজশক্তির সহিত যুদ্ধ করেন, অন্যদিকে তেমনি নানা ছলে অনেক করদ রাজ্য আত্মসাৎ করেন।

তিনি এক জবরদস্তি নিয়ম করেন যে, করদ রাজগণের কেহ নিঃসন্তান দেহত্যাগ করিলে তাঁহার দত্তক পুত্র পিতার রাজ্যে অধিকার পাইবে না।

ডালহৌসীর এই ব্যবস্থায় ভীত হইয়া গঙ্গাধর রাও দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ঝান্সীর ইংরাজ রেসিডেণ্টের নিকট অনুনয়-বিনয়পূর্ণ এক পত্র লেখেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন তাঁহার আজীবন আনুগত্যের কথা স্মরণ করিয়া ইংরাজ সরকার নিশ্চয়ই তাঁহার পত্নী ও পুত্রকে রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবেন না। কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী'। তাঁহার মৃত্যুর পরই ডালহৌসীর আদেশে ঝান্সী ইংরাজের রাজ্যভুক্ত হইল।

রাজ্য গেল। শাস্ত্রানুসারে দত্তক-গৃহীত তাঁহার পুত্র স্বেচ্ছাচারী ইংরাজ সরকারের ইচ্ছায় ন্যায় ও শাস্ত্রানুমোদিত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। ইহাতে লক্ষ্মীবাইয়ের প্রাণে দারুণ বেদনা বাজিল। তিনি নানা যুক্তি দেখাইয়া ইহার প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত আবেদন-নিবেদন, সমস্ত যুক্তিতর্ক

অগ্রাহ্য হইল। ইহাতে তাঁহার প্রাণে ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত হইল।

রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের বয়স এ সময় মাত্র উনিশ কুড়ি বৎসর। কিন্তু ইহার মধ্যে তাঁহার সুখ্যাতিতে দেশ ভরিয়া গিয়াছিল। যেমন অপরূপ রূপ, তেমনি প্রতিভা—উভয়ের সম্মিলনে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবী ভগবতী বলিয়া মনে হইত। প্রজাবর্গ তাঁহাকে মায়ের ন্যায় ভক্তি করিত, ভালবাসিত। ইংরাজ প্রতিনিধি মেজর ম্যাল্‌কম্ স্বয়ং বলিয়াছিলেন, "লক্ষ্মীবাই অতিশয় মাননীয়া এবং রাজ-প্রতিনিধিত্বের সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্রী। তাঁহার স্বভাব অতি উচ্চ-ভাবের পরিচায়ক। ঝান্‌সীর সকলেই তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় সম্মান দেখাইয়া থাকে।" কিন্তু যোগ্যাযোগ্য বিচার করা ত ইংরাজের উদ্দেশ্য নয়; যে-কোন প্রকারে রাজ্যলাভ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। তাই ইংরাজ লাটের বিচারে তাঁহার ঝান্‌সী ইংরাজের অধিকারে লওয়াই সাব্যস্ত হইল।

এই বিষয়ে আলোচনার সময়ে তেজস্বিনী

লক্ষ্মীবাই ইংরাজ রেসিডেণ্টকে ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিলেন—"মেরি ঝান্সী দেঙ্গে নেহি" (আমার ঝান্সী দিব না)। তাঁহার এই তেজঃপূর্ণ দৃঢ়স্বরে রেসিডেণ্ট স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—লক্ষ্মীবাইয়ের হৃদয়ে অবমাননার রেখা গাঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া ঝান্সী ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত করা হইল।

এইরূপ নানা অত্যাচার অবিচারে দেশবাসী উত্যক্ত হইয়া উঠিল এবং ফলে ইহার ৩।৪ বৎসর পরে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজের এদেশীয় সিপাহী সৈন্যেরা বিদ্রোহী হইল। এই সিপাহী-বিদ্রোহ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। প্রতিহিংসাপরবশ হইলে মানুষ যে মানুষের উপর কত বড় পাশবিক অত্যাচার করিতে পারে, তাহা ইহাতে বিশেষ ভাবে দেখা গিয়াছিল। আবার অন্যদিকে ভারতের নরনারী শত্রুদিগের প্রতিও কিরূপে প্রাণ-বিনিময়ে করুণা দেখাইতে পারে তাহারও কত মধুর দৃষ্টান্ত ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

এই ভীষণ বিদ্রোহে মাদ্রাজ ও বোম্বাই ভিন্ন অন্য প্রায় সমস্ত প্রদেশের সিপাহীরাই যোগদান করিয়াছিল। বাঙ্গালী এবং পাঞ্জাবের শিখগণ নানারূপে ইংরাজের সহায়তা করিয়াছিল। সিপাহীরা মোগলবংশের বাদশাহ্ নামধারী বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ্কে ভারত-সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল। তিনি, তাঁহার পুত্রগণ, মৃত পেশোয়া বাজীরাওয়ের দত্তক পুত্রদ্বয়—নানা সাহেব ও রাও সাহেব, তান্তিয়া তোপী নামক একজন ব্রাহ্মণ,রাণী লক্ষ্মীবাই এবং আরও কয়েকজন ব্যক্তি এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব করেন।

যদিও লক্ষ্মীবাই ইংরাজের উপর নিতান্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাহা হইলেও প্রথমেই স্বেচ্ছায় এই বিদ্রোহে তিনি যোগদান করেন নাই; ইংরাজই তাঁহাকে বিদ্রোহী হইতে বাধ্য করিয়াছিল। বিদ্রোহের প্রারম্ভে ঝান্সীস্থিত সিপাহীগণও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহাদের উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়া তথাকার ডেপুটি কমিশনার সাহেব ইংরাজ স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাগণকে রক্ষা করিবার জন্য লক্ষ্মী-

বাইয়ের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং তিনিও তাহাদিগকে নিজ প্রাসাদে সযত্নে আশ্রয় দিলেন। ইহার পর যথার্থ বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে সাহেব ঐ সমস্ত স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকা ও অন্যান্য ইংরাজ-গণকে লইয়া দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায়ও লক্ষ্মীবাই কয়েকদিন পর্য্যন্ত গোপনে খাদ্যাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই সিপাহীগণ দুর্গ অধিকার করিয়া ইংরাজ নরনারীগণকে হত্যা করিল। মাত্র ৩ জন ইংরাজ প্রাণ লইয়া পলাইতে সক্ষম হইয়াছিল। এ হত্যাকাণ্ডে রাণীর বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না। তিনি এ যাবৎ ইংরাজগণকে নানা রূপে সাহায্য করিয়াই আসিয়াছিলেন। কিন্তু তবুও অকৃতজ্ঞ ইংরাজ লেখকগণ তাঁহাকে দোষ দিতে ত্রুটী করেন নাই।

দুর্গ অধিকার করিয়া সিপাহীরা রাণীর প্রাসাদ আক্রমণ করিল এবং নিঃসহায়া রাণীর নিকট হইতে নগদে ও অলঙ্কারে লক্ষ টাকা আদায় করিয়া তবে ছাড়িল। এই টাকা পাইয়া সিপাহীরা তাঁহার

জয়ধ্বনি করিতে করিতে এবং তিনিই ঝান্‌সীরাজ্যের মালিক এই ঘোষণা করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

এখন ঝান্‌সী অরক্ষিত ও অরাজক হইয়া পড়িল, প্রজাগণের দুর্দ্দশার একশেষ হইল। সুতরাং বাধ্য হইয়া রাণীকে ইহার শাসনভার গ্রহণ করিতে হইল। রাজ্যচ্যুত হইলেও কোমলহৃদয়া রাণী পুত্রতুল্য প্রজাগণের দুঃখ সহিতে পারিতেন না। তিনি ইংরাজ সরকারে এ সংবাদ জানাইলেন। ইংরাজ তাঁহার সদভিপ্রায় বুঝিল না। তাহারা মনে করিল তিনি সিপাহীগণের সাহায্যে নিজরাজ্য উদ্ধার করিলেন। তিনি তাহা করিলে অবশ্য ন্যায়ের চক্ষে অপরাধী হইতেন না; কিন্তু বিবাদ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি মিত্রভাবে যাহা করিলেন পররাজ্যলোলুপ ইংরাজ তাহা শত্রুভাবে গ্রহণ করিল!

শাসনভার গ্রহণ করিয়া রাণী প্রায় দশমাস অতি দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করেন।

তাঁহার যেমন সাহস, শক্তি, রাজনৈতিক চাতুর্য্য, দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা ছিল, তেমনি দয়া, ক্ষমা, ও সহানুভূতি ছিল। প্রজাবর্গ তাঁহার দেবীর ন্যায় রূপে মুগ্ধ এবং মাতার ন্যায় ব্যবহারে ভক্তিপরায়ণ ছিল। তাঁহার শাসনগুণে ও সস্নেহ ব্যবহারে দেশবাসী এতদূর বশীভূত ছিল যে ইংরাজদিগের নিকট শত্রুগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয়ের পাত্রী ছিলেন। ইংরাজ সেনাপতি সার হিউ রোজ তাঁহার এই সমস্ত গুণের উল্লেখ করিয়া অনেক প্রশংসা করিয়াছেন।

শাসনদণ্ড গ্রহণ করিবার পরই তাঁহাকে তাঁহার এক আত্মীয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। এই যুদ্ধের অবসান হইতে না হইতেই পার্শ্ববর্ত্তী এক রাজ্যের সেনাপতি বহু সৈন্য লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। রাণীর তেমন সৈন্যবল ছিল না। তিনি শীঘ্র সৈন্যসংগ্রহ করিয়া এবং কারখানা বসাইয়া গোলা-গুলি, কামান ও বারুদ প্রস্তুত করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে তাঁহারই জয় হইল।

যুদ্ধের সময় তিনি সৈন্যগণের প্রতি মাতার ন্যায় সস্নেহ ব্যবহার করিতেন—তাহাদের যাতনায় অশ্রু-বর্ষণ করিতেন, তাহারা আহত হইলে স্বয়ং চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিতেন এবং কাছে বসিয়া মিষ্ট বাক্যে ও গায়ে হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিতেন।

এই সমস্ত যুদ্ধের সংবাদ তিনি ইংরাজ সরকারের নিকট পাঠাইয়াছিলেন—বরাবরই তিনি ইংরাজের সহিত মিত্রভাব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সমস্ত বিফল হইল। অপরাধী ইংরাজ কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না যে তাঁহার মনে শত্রুভাব নাই। শীঘ্রই সেনাপতি সার হিউ রোজ বহু সৈন্য লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তখনও তিনি মিত্রভাবে দূত পাঠাইয়া এই আক্রমণ নিবারণের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু বিফল হইয়া অবশেষে তাঁহাকে যুদ্ধের আয়োজন করিতে হইল। এত দিনে তিনি তাঁহার নিজের ও স্বদেশের মর্ম্মান্তিক শত্রু ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-পতাকা উড়াইলেন।

সার হিউ রোজ ঝান্সী অবরোধ করিলেন। রাণীর সৈন্যসংখ্যা অতি সামান্য—এগার হাজার মাত্র। এই সামান্য সৈন্য তাঁহার অপূর্ব্ব শৃঙ্খলায় পরিচালিত হইয়া নগর রক্ষা করিতে লাগিল। এই সময়ে দিন রাত্রি কখনও রাণীর অবসর ছিল না। পুরুষ বেশে ঘোড়ায় চড়িয়া একাকী তিনি সমস্ত পরিদর্শন করিয়া ও উপযুক্ত আদেশ দিয়া বেড়াইতেন, সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিতেন এবং বিপক্ষের গোলায় নগর প্রাচীর ভাঙ্গিলে তাহার সংস্কারের ব্যবস্থা করিতেন। ঝান্সীর রমণীগণ অনেকে তাঁহাকে অশেষবিধ সাহায্য করিয়াছিলেন—নিজেরা অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বিপুল বিক্রমে দশ এগার দিন নগর রক্ষা করিয়া অবশেষে রাণী পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। যুদ্ধের সূচনাতেই তিনি তান্তিয়া তোপীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তান্তিয়া সাহায্য লইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন; কিন্তু পথিমধ্যেই ইংরাজ সৈন্য তাঁহাকে পরাজিত করিল।

ইংরাজ ঝান্‌সী অধিকার করিয়া গৃহে গৃহে আগুন লাগাইয়া দিল, বহুসংখ্যক নরনারী হত্যা করিল এবং নগরবাসীর যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিল। বহু নারী সতীত্বনাশের ভয়ে কূপে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন অনেককে তাঁহাদের প্রিয়জনেই হত্যা কয়িয়া রক্ষা করিলেন।

ঝান্‌সী হইতে পলায়ন করিয়া লক্ষ্মীবাই কাল্পী পৌঁছিলেন। পলায়নের সময় অষ্টম বর্ষীয় বালক-পুত্র দামোদর রাওকে পিঠের সহিত বাঁধিয়া লইয়াছিলেন। কাল্পীতে তিনি বীরবর তান্তিয়া তোপীর সহকারিণী হইলেন। তথায় তখন রাও সাহেব ছিলেন প্রধান নেতা। এখানে ইংরাজের সহিত এক যুদ্ধ হইল। রমণী বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া রাও সাহেব রাণীকে মাত্র আড়াই শত অশ্বারোহী সৈন্য পরিচালনার ভার দিয়াছিলেন। কার্য্যক্ষেত্রে কিন্তু দেখা গেল এই অবলা রমণী তাঁহার আড়াই শত মাত্র সৈন্য লইয়া প্রবল ইংরাজ সৈন্যের একাংশ পরাজিত করিয়াছেন, আর অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্যের

সহিত রাও সাহেব নিজে পরাজিত ও যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন। রাও সাহেবের পলায়নে রাণীকে বাধ্য হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিতে হইল। তখন কাল্পীও ইংরাজের হস্তগত হইল।

রাও সাহেব যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া একেবারে পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এখন পলায়ন করিলে সমস্ত আশা সমূলে বিনষ্ট হইবে বলিয়া রাণী অনেক করিয়া বুঝাইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। নিকটে সিন্ধিয়ার সুদৃঢ় গোয়ালিয়র দুর্গ ছিল। সিন্ধিয়া ইংরাজের পক্ষে। রাণী এই দুর্গ অধিকার করিয়া তথা হইতে ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। রাও সাহেব তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। একমাত্র রাণীর বিক্রমে ও কৌশলে সিন্ধিয়া পরাজিত ও দুর্গ অধিকৃত হইল।

রাও সাহেব অকর্ম্মণ্য, বিলাসপরায়ণ ও দাম্ভিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। গোয়ালিয়র অধিকৃত হইলে তিনি উৎসবে মত্ত হইলেন, রাণীর উপদেশে কর্ণপাত করিলেন না। এরূপ বিপদের সময় সৈন্যগণের

মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকাই উচিত ছিল। তাহার কিছুই হইল না। ফলে শীঘ্রই যখন ইংরাজ সেনাপতি সার হিউ রোজ সসৈন্যে গোয়ালিয়রের দিকে অগ্রসর হইলেন, তখন চারিদিকে অব্যবস্থা। তান্তিয়া তোপী এবং লক্ষ্মীবাই তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইতে না হইতেই ইংরাজ-সৈন্য গোয়ালিয়র আক্রমণ করিল।

রাণীর উপর গোয়ালিয়রের পূর্ব্বদিক রক্ষা করিবার ভার পড়িল। তিনি পুরুষবেশে ঘোড়ায় চড়িয়া সমস্ত দিন ধরিয়া সৈন্যগণের পরিচালন-ব্যবস্থা এবং নগর রক্ষার অন্যান্য বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন সমস্ত দিন ধরিয়া ভীষণ যুদ্ধ হইল। রাণী ক্ষণমাত্র বিশ্রাম না করিয়া অদম্য উৎসাহে ও অপূর্ব্ব রণকৌশলের সহিত সৈন্য-পরিচালনা করিলেন। কিন্তু ভাগ্য বিমুখ! যুদ্ধে ইংরাজগণেরই জয় হইল।

কয়েকজন সহচরীও রাণীর সহিত অশ্বারোহণে যুদ্ধ করিতেছিলেন। অবশেষে তাঁহাদের দুইজনকে

ও কয়েকজন পুরুষ অনুচর লইয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন।

কয়েকজন অশ্বারোহী ইংরাজ রাণীর পশ্চাদ্ধাবন করিল। রাণী অশ্বারোহণে সকলের আগে ছুটিতে-ছিলেন। সহসা পশ্চাতে কাতর শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখেন একজন ইংরাজ তাঁহার একজন সহচরীকে আক্রমণ করিয়াছে। দেখিয়াই তিনি ফিরিলেন—বিদ্যুৎবেগে আসিয়া তরবারির এক আঘাতে দুর্ব্বৃত্ত ইংরাজকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া পুনরায় ছুটিলেন।

ছুটিতে ছুটিতে তিনি একটি ক্ষুদ্র নদীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ক্লান্ত অশ্ব কিছুতেই নদী পার হইতে চাহিল না। এমন সময়ে অনুসরণ-কারী ইংরাজ সৈন্যগণ আসিয়া পড়িল। তখন তরবারিতে তরবারিতে ভীষণ যুদ্ধ চলিল। সমস্ত দিনের যুদ্ধে ও অশ্বচালনে একান্ত পরিশ্রান্ত রাণী সামান্য কয়েকজন অনুচর লইয়া ইহাদের সহিত কতক্ষণ যুদ্ধ করিবেন! শীঘ্রই বিপক্ষের তরবারিতে

দারুণ আহত হইয়া তিনি ভূপতিত হইলেন। নিকটে এক সন্ন্যাসীর আশ্রম ছিল। তাঁহার একজন অনুচর তাঁহাকে ধরিয়া সেই আশ্রমে লইয়া গেল। সেখানে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

শক্তিরূপিনী ভারত-লক্ষ্মী লক্ষ্মীবাই প্রথম যৌবনেই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সামান্য কয়েক বৎসরের জীবন তাঁহার। কিন্তু ইহারই মধ্যে যে গৌরবময় অবদানে তিনি চিরদিনের জন্য জননী জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন জগতের ইতিহাসে কয়জনের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়াছে! হায়! কবে আবার এই পতিত ভারতে লক্ষ্মীবাইয়ের মত নারীর জন্ম হইবে!

কস্তুরীবাঈ।

দিন গিয়াছে—যখন বীরত্বের একমাত্র আদর্শ ছিল দেশ-জয় করা, রাজ্য ও রাজা ভাঙ্গা-গড়া; যখন বীর ভালবাসিতেন কেবল 'অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি'। এখন আদর্শ বদলাইয়াছে; এখন বীরের আকাঙ্ক্ষা অত্যাচারের সম্মুখে সানন্দে বুক পাতিয়া দিয়া নীরবে সমস্ত সহ্য করা, ক্ষমাদ্বারা তাহাকে জয় করা, অহিংসার দ্বারা হিংসার তীক্ষ্ণতা দূর করা। হিংসিতের অহিংসাই এখন বীরত্বের চরম আদর্শ। যিনি এই নব আদর্শের প্রচারক, যিনি নিজের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দ্বারা এই আদর্শকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই মহাত্মা গান্ধীর নাম আজ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইতেছে।

শ্রীমতী কস্তুরীবাই মহাত্মার উপযুক্ত পত্নী। তিনি স্বামীর আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিয়া ভারতের

বীরাঙ্গনাগণের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছেন। পাতিব্রত্যের জন্য যদি পূর্ব্বকালে ভারত-নারী দেবীর আসন পাইয়া থাকেন,তাহা হইলে তিনিও দেবী বলিয়া পূজনীয়া; যদি দেশের জন্য দুঃখবরণ করিয়া লইলে মানুষ অমর হইবার যোগ্য হয়, তাহা হইলে তিনিও অমর হইবেন। মহাত্মার জন্ম-পত্রিকায়ই আছে, 'পূর্ব্বজন্মনি সংবাধাদ্ যথানাম্নি তথৈব সা'; সার্থক-নাম্নী কস্তুরীবাইয়ের যশঃসুগন্ধে দিক পরিপূরিত হইয়াছে; ভারত যতদিন থাকিবে ততদিন এ সুগন্ধ লোপ পাইবে না।

মোহনদাস গান্ধীর বয়স তখন বার বৎসর মাত্র। তিনি রাজকোট রাজ্যের দেওয়ানের প্রিয় পুত্র। পিতামাতা এই শিশুপুত্রকে বিবাহ দিবার জন্য কস্তুরী নাম্নী ততোধিক শিশু একটি বালিকাকে বাটীতে লইয়া আসিলেন। বালক-বালিকা একসঙ্গে খেলা-ধূলা করিয়া বেড়াইতেন। কিছু দিন পরে মহাসমারোহে তাঁহাদের বিবাহ হইল। সেই যে মিলন হইল, সেই অবধি কস্তুরীবাই সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে তাঁহার

মহাপুরুষ স্বামীর সহচারিণী সহায়িকা হইয়া রহিয়াছেন।

অল্প বয়সে প্রবেশিকা পাশ করিয়া মোহনদাস ব্যারিষ্টারী পড়িতে ইংলণ্ড গমন করিলেন। পাশ করিয়া আসিবার কিছুদিন পরে মিঃ গান্ধী এক মোকদ্দমায় নিযুক্ত হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন। সেখানে ভারতবাসীর প্রতি ইউরোপীয়গণের অকথ্য অত্যাচারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তিনি তাহার প্রতিকারকল্পে আত্মনিয়োগ করিলেন। ইউরোপীয়গণ তাঁহার উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল। কিছুদিন পরে তিনি ভারতে আসিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া পুনরায় তথায় গমন করিলেন। এখন হইতে মহীয়সী কস্তুরীবাই তাঁহার সহিত দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। কিছুদিন পরে স্বামী ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করিলে, বীরজায়া সানন্দে দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইলেন। ইহার পর বার বার তিনি হাসিমুখে স্বামী-পুত্রকে গভর্ণমেণ্টের অত্যাচার সহিতে, কারা-বাসে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে পাঠাইয়াছেন।

নিজে গৃহে থাকিয়া স্বামীকে সর্ব্বরকমে সাহায্য করিয়াছেন।

একবার গভর্ণমেণ্ট আইন করিলেন ভারতীয়গণ রাস্তায় ফেরি করিতে পারিবে না। গভর্ণমেণ্টের এ অন্যায় আদেশের প্রতিবাদ করিতে বীরদম্পতি মস্তকে মোট লইয়া নিজেরা ফেরি করিতে লাগিলেন। ধনীর কন্যা, রাজ-দেওয়ানের পুত্রবধূ, বিখ্যাত ব্যারিষ্টারের পত্নী হইয়াও কস্তুরীবাই স্বামীর সঙ্গে এই কাজ করিতে বিন্দুমাত্র ঘৃণা, লজ্জা বা দুঃখ বোধ করিলেন না।

আর একবার গভর্ণমেণ্ট আইন করিলেন ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের পত্নী আইনের চক্ষে বিবাহিত বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। কি ভয়ঙ্কর কথা! মদদত্ত ইংরাজ আইনের বলে সতীত্ব উড়াইতে চাহে! সমগ্র ভারতীয় সমাজ প্রতিবাদ করিলেন। ভারতীয় মহিলাগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া কস্তুরীবাই গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নিরুপদ্রব প্রতিরোধে যোগদান করিলেন। ইহার ফলে তাঁহার তিনমাস সশ্রম

কারাদণ্ড হইল। তিনি হাসিমুখে আনন্দিতমনে কারাক্লেশ সহ্য করিলেন। আইন প্রত্যাহৃত হইল; তিনি জয়যুক্ত হইলেন।

এইরূপে গভর্ণমেণ্টের প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়া অশেষ রকমে কষ্ট সহ্য করিয়া তাঁহারা দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর অবস্থার অনেক উন্নতি-সাধন করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া মহাত্মাজী যখন যে কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহাতেই এই মহাপ্রাণা সতীর সহায়তা লাভ করিয়াছেন। স্বামী-স্ত্রীতে কখনও তাঁহারা হিংসা বা বলপ্রয়োগের দ্বারা কিছু করেন নাই; কিন্তু কোনও অন্যায়ও তাঁহারা নির্বিবাদে সহ্য করেন নাই। পাঞ্জাবে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট যে ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহার ফলে অসহযোগ আন্দোলন চলিতেছে। হিংসিতের অহিংসা যে কি ভীষণ অথচ শান্তিপূর্ণ অস্ত্র তাহা এই আন্দোলন জগতের সমক্ষে প্রচার করিয়াছে।

যেমন সাধারণের কাজে তেমনি গৃহকার্য্যেও কস্তুরীবাই স্বামীর প্রধান সহায়। আহমদনগরে সবরমতী তীরে সত্যাগ্রহাশ্রম নামক একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইঁহারা সপরিবারে বাস করিতে-ছেন। শ্রীমতী কস্তুরীবাইকে এখানে রন্ধনাদি অনেক কার্য্য স্বহস্তে করিতে হয়; তাহাতে তাঁহার দুঃখ নাই—এ যে সতীর ধর্ম্ম।

সে বৎসর যখন মহাত্মা কারারুদ্ধ হইলেন, তখন তিনিই গুজরাটে স্বামীর আরব্ধ স্বাধীনতা-সংগ্রাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। গুজরাটবাসীও তাঁহাকে সম্মান দেখাইতে ত্রুটী করেন নাই। তিনি ১৯২২ সালে গুজরাট প্রাদেশিক সম্মেলনের সভানেত্রী মনোনীত হন।

জানি না, এরূপ স্ত্রীলাভ না করিলে মহাত্মাও আজ জগৎজোড়া পূজার অধিকারী হইতে পারিতেন কি না। এরূপ মহিলা যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই উজ্জ্বল। তিনি খুব বেশী শিক্ষিতা নহেন; কিন্তু সীতা-সাবিত্রীর দেশে নিশ্চয়ই

তিনি চিরকাল পূজা পাইবেন। গুজরাটবাসী তাঁহাকে 'বা' (মা) বলিয়া ডাকেন। চিরযুগে তিনি ভারতবাসীর মা হইয়া থাকিবেন ; তাঁহার আদর্শে ভারতনারী বললাভ করিবে, কল্যাণের পথ চিনিবে।

বন্দেমাতরম্